হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ

[বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতা, ১৯৩৫]

কাজী আবদুল ওদুদ

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Scanned with CamScanner

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ

[বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতা, ১৯৩৫]

কাজী আবদুল ওদুদ

অধ্যাপক, ঢাকা ইনটারমিডিয়েট্ কলেজ

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

এদেশে হিন্দুমুসলমান-বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্ব্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন ক'রে আছে এমন এক-একটি সেতু। আব্দুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলাভাষায় তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতা। তাই একদিন সমাদরপূর্ব্বক তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আহ্বান করেছি, অনুরোধ করেছি বিশ্ব-ভারতীর বিদ্যাভবনে বক্তৃতা করবার জন্যে। আমার সাগ্রহ প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হয়নি এই আনন্দটুকু জানাবার অভিপ্রায়ে আমার এই কয়টি ছত্র লেখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

২১ মাঘ, ১৩৪২

Scanned with CamScanner

নিবেদন

বিশ্বভারতীতে "নিজাম বক্তৃতা"র বিষয় মুস্‌লিম সংস্কৃতি। "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ" "নিজাম বক্তৃতা"র বিষয়রূপে গণ্য ক'রে বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ শুধু যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা নয় তাঁদের সুপরিচিত সজাগ মনের পরিচয়ও দিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ দেশের বা জাতির সংস্কৃতি বা চিত্তোৎকর্ষ মানুষের শিক্ষিত মনের জন্য একশ্রেণীর কৌতূহলরস-রূপে আহরণ করা অনেক পণ্ডিত ও ভাবুক ব্যক্তির সাধনা। তাঁদের সে-সাধনা সুচিরস্থায়ী হোক। কিন্তু জাতীয় বা দেশগত সংস্কৃতি প্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষের প্রতিদিনের জীবনের ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িত, তার অবসর-বিনোদনের বিষয়মাত্র নয়। হিন্দুমুসলমানের বিরোধ বল্‌তে আমাদের দেশের যে বিপর্য্যস্ত মানসিকতা বোঝায় দেশের সর্ব্বব্যাপী সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার সাংঘাতিকতার গুরুত্ব সম্বন্ধে চেতনা বিশ্বভারতীর মতো জাগ্রত জ্ঞানকেন্দ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ শোভন হয়েছে সন্দেহ নেই। আর যাঁর নামের সংস্রব বহন ক'রে এই সব বক্তৃতা গৌরবান্বিত তাঁরও শুভাকাঙ্ক্ষার মর্য্যাদা এতে সার্থক বৈ ক্ষুণ্ণ হয় নি, কেন না, যে-চিত্তোৎকর্ষের রসায়নে তাঁর মানসলোক সঞ্জীবিত—তাঁর নানা ফর্‌মানে যার প্রকাশ—তা ভারতের মোগল-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বৈভব—বিলাস নয় দেশের বুকে এক নব সৃষ্টির প্রয়াসের প্রেরণা তার মর্ম্মমূলে।

এই গুরু বিষয়ের আলোচনায় আমি অগ্রসর হয়েছি জ্ঞানের স্পর্দ্ধায় নয়, দুঃখের তাড়নায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত আশীর্ব্বাদে আমার সেই সামান্য প্রয়াস মহিমান্বিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকই আমি ভাগ্যবান্ হব যদি আমার দেশবাসীর কাছে এই একটিমাত্র কথা পৌঁছে দিতে পেরে থাকি যে হিন্দুমুসলমান বিরোধ সম্বন্ধে তাঁদের ঔদাসীন্য জ্ঞানীর বা শক্তিমানের ঔদাসীন্য নয়, সে-সম্বন্ধে তাঁদের সুপরিচিত সিদ্ধান্তও স্বস্তিপ্রিয়তার অন্য নাম।

গ্রন্থকার

ঢাকা

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

Scanned with CamScanner

সূচী

Scanned with CamScanner

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ

প্রথম বক্তৃতা

মুসলমানের পরিচয়

স্যর সুরেন্দ্রনাথ তাঁর A Nation in Making গ্রন্থে বল্‌তে চেয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সূচনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে, তার পূর্ব্বে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ছিল। এ-ধারণা শুধু স্যর সুরেন্দ্রনাথের নয়, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির। এর বিশেষ অর্থের আলোচনা আমার তৃতীয় বক্তৃতায় কর্‌বো। আপাততঃ বলা যায়, কোনো কোনো অর্থে এ-কথা সত্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিচ্ছিন্ন জিনিষ জড়ের মত পড়িয়া থাকিলে তবু টিঁকিয়া থাকে, কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে ; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্ব্বলতা নানা মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়।" স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে-রাজনৈতিক স্বার্থ-বোধ দেশে জাগ্‌লো তার ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ উত্তরোত্তর প্রবল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ মধুর ছিল ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তার বিরুদ্ধে। এমন কি, দেশের এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ শুধু অপরিচয়ের সম্বন্ধ ছিল এও বলা যায় না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরিদপুরে ও যশোহরে মুসলমান চাষী ও নমঃশূদ্রদের ভিতরে দীর্ঘকালব্যাপী একাধিক দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে সেই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের অনেকে দুই পক্ষে যোগ দিয়েছিল। *মোগল-শাসনের শেষভাগে গুজরাটে ও কাশ্মীরে যে দুটি ভীষণ

* ফিরোজাবাদের দাঙ্গার তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতেও এই ধরণের দাঙ্গা সেখানে হয়েছিল। —লেখক।

Scanned with CamScanner

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল বিখ্যাত ইতিহাস "সিয়ার মোতাখেরীণ"এ তার উল্লেখ আছে এই ভাবে :—

সম্রাট ফেরোহ্‌শিয়ারের সিংহাসনারোহণের বৎসরে আহ্‌মদাবাদে এক হিন্দু গৃহস্থ হোলির সময়ে তার বাড়ির উঠানে হোলি জ্বালালে। তখন হোলির সময়ে বিষম মাতামাতি হতো। আঙিনা-সংলগ্ন ও আঙিনার অতি অল্প অংশের অধিকারী মুসলমান গৃহস্থেরা তাতে আপত্তি করলে। হিন্দু গৃহস্থ সে আপত্তি শুনলে না, বল্লে, প্রত্যেকের তার নিজের বাড়িতে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব আছে। পরের দিন পড়লো হজরত মোহম্মদের মৃত্যু- বার্ষিকী। সেই উপলক্ষে মুসলমান গৃহস্থেরা একটি গরু কিনে এনে সেই আঙিনায় জবাই কর্‌লে। এতে সেই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু উৎক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলে, মুসলমানেরা পালিয়ে যে যার বাড়িতে আশ্রয় নিলে। তখন সেই উৎক্ষিপ্ত হিন্দু-জনতা গোহত্যাকারী কশাইয়ের সন্ধান করলে ; তাকে না পেয়ে তার চোদ্দ বৎসর বয়সের ছেলেকে এনে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই গো-হত্যার স্থানে বলি দিলে। তখন শহরের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মুসলমান ও আফ্‌গান্‌-সৈন্য কাজীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো। কাজী জান্‌তেন শাসনকর্ত্তা দায়ুদখাঁ পণি এ ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছেন, তিনি এদের মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা উত্তেজিত হয়ে কাজীর বাড়ির সদর দরজা ভাঙ্‌লে—হয়ত কাজীরই গোপন ইঙ্গিতে—ও তারপরে আরম্ভ কর্‌লে শহরের হিন্দু-দোকানে আগুন দিতে। অচিরেই কাপূর চাঁদ নামক একজন রত্ন-বণিক লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিলে। কয়েকদিন এই ভাবে গণ্ডগোল চল্‌লো। শেষে শাসনকর্ত্তা মুসলমানদেরই বেশী দোষী সাব্যস্ত করলেন।

কাশ্মীরের দাঙ্গাটি এর কিছুকাল পরে ঘটে। সেখানকার আবদুল নবী ওরফে মাহ্‌তাবী খাঁ ভয়ানক হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। এই অরাজকতার কালে একদল ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান জুটিয়ে তাদের নেতা হয়ে সে স্থানীয় সহকারী-শাসনকর্ত্তা ও কাজীর কাছে এই প্রস্তাব কর্‌লে যে এর পরে হিন্দুদের আর কোনো সম্ভ্রমসূচক যান-বাহন বা বস্ত্রাদি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না ; বাগান ও স্নানের ঘাটও তাদের জন্য নিষিদ্ধ হবে। সহকারী-শাসনকর্ত্তা ও কাজী বল্লেন—মহামান্য বাদশাহের যা হুকুম তাই-ই কাশ্মীরে চল্‌বে। বলা বাহুল্য এতে মাহ্‌তাবী খাঁ সন্তুষ্ট হলো না। এর পর তার কাজ হলো সুবিধা পেলেই হিন্দুদের আক্রমণ করা ও তাদের উপরে অত্যাচার করা। একদিন সাহাব রায় নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত হিন্দু এক বাগানে উৎসব করছিলেন। সেই নিরাপরাধ লোকদের উপরে সে তার দলবল

নিয়ে হাম্‌লা কর্‌লে এবং যত পারলে খুন জখম করলে। সাহাব রায় পালিয়ে সহকারী-শাসনকর্ত্তার বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। তাঁর বাড়ী এই মাহ্‌তাবী খাঁর দল ইচ্ছামত লুটতরাজ করলে। সেই অঞ্চলের কোনো হিন্দুবাড়ী বাদ গেল না। এই সব বাড়ীতে আগুন দেওয়াও চল্‌লো। যে সমস্ত মুসলমান এই হতভাগ্যদের জন্য দুকথা বল্‌তে এলেন তাঁরাও খুন জখম হলেন। এই মাহ্‌তাবী খাঁর দলের সঙ্গে কাশ্মীরের রাজপুরুষেরা এঁটে উঠ্‌তে পারলেন না, তাঁরা পালিয়ে গেলেন। তাঁদের আশ্রিত হিন্দুদের উপরে তখন হলো অকথ্য অত্যাচার। জয়ী হয়ে মাহ্‌তাবী খাঁ স্থানীয় জুমা মস্‌জিদে নিজেকে "দীনদার খাঁ" (ধর্ম্মরক্ষক) বলে' ঘোষণা কর্‌লে ও শাসন-কাজ চালাতে লাগলো। রাজপুরুষদের একজনের চক্রান্তে মাহ্‌তাবী ও তার দুই শিশুপুত্র নিহত হলে তার দল উৎকট হত্যাকাণ্ড চালালে। প্রায় তিন হাজার লোক তাদের হাতে মারা পড়লো—তার অধিকাংশই মোগল। কয়েক মাস ধরে' এই দাঙ্গা চলে।

শেষের এই ঘটনাটি "সিয়ার মোতাখেরীণ"-এর লেখক বলেছেন একদল শয়তানের কাজ। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের জন্য সেকালের এই দুটি ঘটনাই খুব অর্থপূর্ণ। একালের কলকাতা, ঢাকা, কানপুর, চাটগাঁ প্রভৃতি স্থানের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সঙ্গে এসবের আশ্চর্য্য মিল রয়েছে।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের মূল কারণ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—The Muhammadan is bully and the Hindu is a coward--মুসলমান গুণ্ডা আর হিন্দু কাপুরুষ। এই কথাই কেউ কেউ তত্ত্বের ভাষায় বলেছেন--মুসলমান রাজসিক, হিন্দু সাত্ত্বিক, তবে দুই-ই কিছু কিছু বিকৃত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রকৃতির ভেদ আছে; তাও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এমন স্পষ্ট ভেদ আছে কি না সন্দেহ। সে-ক্ষেত্রে দুটি বিরাট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে মানস প্রকৃতির দিক থেকে এমন স্পষ্ট দুইভাগে ভাগ করবার চেষ্টায় বিপত্তি ঢের। বাস্তবিক কি সেকালের দাঙ্গা কি একালের দাঙ্গা কোনোখানেই হিন্দুর শুধু কাপুরুষতার ও মুসলমানের শুধু জঙ্গ্‌-বাহাদুরীর পরিচয়ই যে আছে তা নয়। কোনো কোনো শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের ভিতরে কিছু পার্থক্য থাকলেও এই দুই বিরাট সমাজের ভিতরে আশ্চর্য্য কোনো পার্থক্য যে নেই তার প্রমাণ স্বরূপ এই ক'টি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে :—

প্রথমতঃ, গুণ্ডার ভাব দুপক্ষের প্রকৃতিতেই আছে, কেন না, নৃশংসতার পরিচয় কোনো পক্ষে কম নেই, দাঙ্গায় অগ্রণী হবার অপরাধ থেকেও কোনো পক্ষ মুক্ত নয়; ভীরুতাও দুই পক্ষেই আছে, ঢাকার দাঙ্গায় দেখেছি হিন্দুরা মুসলমানের ভয়ে

Scanned with CamScanner

পালিয়েছে, মুসলমান-বস্তী সারারাত জেগে কাটিয়েছে এই ভয়ে যে কখন হিন্দুরা এসে ঘর জ্বালিয়ে দেবে। দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা বলেন, ভারত বিশেষভাবে অহিংসার ও পরধর্ম্মপ্রীতির দেশ তাঁদের দৃষ্টি এই ঐতিহাসিক ব্যাপারের দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত—(ক) হিন্দু ও বৌদ্ধের বিরোধিতায় বৌদ্ধ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, বৌদ্ধদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছিল কোনো কোনো খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের এই মত,* বৌদ্ধদের যে একটি বিরাট সংস্কৃতি ছিল একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মনীষী আল্‌বেরুণী তাঁর ব্রাহ্মণ-আচার্য্যদের কাছ থেকে সে-সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দেশ পান নাই। (খ) যদি চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও বৌদ্ধজাতক ভারতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য মনে করা না হয় তবে বলা যায়, স্বজন শোণিত-রঞ্জিত সিংহাসন শুধু পাঠান ও মোগল ভারতের বিশেষত্ব নয়, হয়ত ভারতের বিশেষত্ব। তৃতীয়তঃ, মুসলমানের ইতিহাস হিন্দুর মতন দীর্ঘ না হলেও কম দীর্ঘ নয়, ঘটনাবহুল ত বটেই। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও নাস্তিক্য, একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ; একান্ত দৈবানুগত্য ও একান্ত পুরুষকার-বাদ, একান্ত শাস্ত্রানুগত্য ও একান্ত মুক্তবুদ্ধি-প্রবণতা, প্রেম ও অহিংসা এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি ও পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ—এর কিছুই হিন্দু ও মুসলমান কারো ইতিহাসে দুর্লভ নয়। আর সব চাইতে বড় কথা এই—এই দুই সম্প্রদায়ই জীবন্ত, কারো অভিব্যক্তি থেমে যায়নি।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের কারণ কি সোজাসুজি ভাবে এই দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়াই ভাল। তার পরিবর্ত্তে মুখ্যতঃ তাদের বর্ত্তমান চিন্তা-ভাবনার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে এ-বিরোধ মীমাংসার, অন্ততঃ এ বিরোধে অভিভূত না হবার, কিছু শক্তি আমাদের লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। মুসলমান কম পরিচিত, সেজন্য তার পরিচয় আগে নেবার দরকার। কিন্তু তার একালের পরিচয় লাভের জন্যও অল্প বিস্তর পূর্ব্বাভাসের প্রয়োজন।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা হজরত মোহম্মদের প্রচার-জীবন সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করে দেখেন—মক্কার জীবন ও মদিনার জীবন। তাঁরা বলেন মক্কার জীবনে তিনি ছিলেন ধর্ম্মপ্রচারক—অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকের মতো সত্যদ্রষ্টা মানব-প্রেমিক নীতির প্রবর্ত্তক এ-সব বিশেষণ তখন তাঁর জন্য শোভন; কিন্তু মদিনার জীবনে তিনি বিজয়ী বীর ও রাষ্ট্রের অধিনায়ক। অপরপক্ষে মুসলমান চিন্তাশীলেরা তাঁর মদিনার জীবনকেই বেশী মর্য্যাদা দেন, কেননা মুসলমান-মণ্ডলী তাঁদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা

* ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শ্যাম শাস্ত্রীর মতে ব্রাহ্মণেরা কৌশলে বৌদ্ধদের পর্য্যুদস্ত করেছিল, বলে নয়। "Evolution of Indian Polity" দ্রষ্টব্য।

সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন নির্দ্দেশ তাঁর মদিনার জীবন থেকেই লাভ করে আসছেন। এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে দুই রকমের ভুল। অমুসলমান দলের ভুল--তাঁরা ধর্ম্ম বল্‌তে প্রধানতঃ প্রাচীন আচার্য্যদের জীবনাদর্শ ও মতামতই বোঝেন; কোনো নূতন আদর্শ ও মত হজরত মোহম্মদের জীবনে ও সাধনায় রূপ লাভ করেছে কিনা সে-কথাটি বুঝে দেখবার মতো ধৈর্য্যের ও বিনয়ের তাঁদের অভাব। আর মুসলমান দলের ভুল —যাঁকে তাঁরা ধর্ম্মগুরু জ্ঞান করেছেন তাঁর সব কাজই তাঁরা মনে করেন বিচারের অতীত।

যাই-ই হোক, হজরত মোহম্মদের মদিনার জীবনের প্রভাবেই মুসলমান-জগৎ গড়ে উঠেছে। সেই জীবনের ভূমিকা হচ্ছে মুসলমান-মণ্ডলীর প্রতি পৌত্তলিক ও ইহুদি আরবদের নির্ম্মম শত্রুতা যারজন্য নায়কের একান্ত অনুবর্ত্তিতা, একচিত্ততা, বিপক্ষের প্রতি সন্দেহশীলতা, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জন্য অবশ্যকাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যাঁরা বলেন, মদিনার মোহম্মদ মুখ্যতঃ রাষ্ট্রনেতা, তাঁরা এই বড় ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে ভুলে যান যে তাঁর জীবনের এই কালে তাঁর প্রেরণা-লব্ধ কোর্‌আনে যেসব নির্দ্দেশ প্রকাশ পেয়েছে আর মুসলমান-সমাজে সেসবের যে রূপ লাভ হয়েছে তা তাঁর শিক্ষার চিরন্তণ রূপ না বলে সাময়িক রূপও বলা যেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মদিনায় অবতীর্ণ একটি “সুরা”র শেষে বলা হয়েছে— “হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র রোষে যারা পতিত হয়েছে সেই দলের লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না (৬০ : ১৩)। টীকাকার বলেছেন, এখানে ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। সমসাময়িক মুসলমানেরা হয়ত এই কথাই ভাল করে' বুঝেছিলেন এবং তাঁদের অনুবর্ত্তিতায় পরবর্ত্তী মুসলমানেরা হয়ত বুঝে নিয়েছেন—যারা মুসলমান-সম্প্রদায়-ভুক্ত নয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোর্‌আনের অনভিপ্রেত। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় এই বাক্যের সত্যকার মর্য্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে সেই দিনে মুসলমান বিশেষভাবে ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন আর তাঁদের ধ্বংসকামী গর্ব্বিত ইহুদি ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণতা কোনো সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, তাই কালে কালে এমন অবস্থার উদয় সম্ভবপর যখন মুসলমান-সমাজের ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বন্ধু সেই সমাজে দুর্লভ হতে পারে ও সেই সমাজের বাইরে সুলভ হতে পারে—এ-সম্ভাবনার কথা মুসলমান অমুসলমান উভয়পক্ষই যে কোর্‌আনের এই ধরণের বাণীর ব্যাখ্যাকালে বিস্মৃত হয়েছেন একে শোচনীয় না বলে উপায় নেই। তবে মুসলমানের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারায় এই স্থূল ব্যাখ্যাই একমাত্র সত্য নয়, যদিও প্রবল সত্য; মুসলমান দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা ও ভক্তরা অনেকখানি

Scanned with CamScanner

স্বতন্ত্রভাবে কোর্‌আন ও হজরত মোহম্মদের জীবন বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এর একটি দৃষ্টান্ত বড় অদ্ভুত। যে যুগে সুলতান মাহ্‌মুদ ভারতের মন্দির ধ্বংস করে' ধনরত্ন আত্মসাৎ করছিলেন সেই যুগে ইসলামে-পরম-শ্রদ্ধান্বিত আল্‌বেরুণী অশেষ যত্নে ও শ্রদ্ধায় হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান করছিলেন, তার উৎকর্ষাবকর্ষের বিচার করে'. জ্ঞানীদের দরবারে উপহার দিচ্ছিলেন।

ইসলামের পরিস্ফূর্ত্তির মূলে এই যে বিশেষ, রাজনৈতিক প্রভাব একই সঙ্গে এটি ইসলামের শক্তির ও দুর্ব্বলতার কারণ হয়েছে। শক্তির কারণ এই জন্য যে ধর্ম্মাদর্শের সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ-লাভ তার সার্থকতার জন্য একান্ত বাঞ্ছিত, নইলে তা রয়ে যায় শুধু সম্ভাব্যতার দেশের ব্যাপার। এর দৃষ্টান্ত--ইসলামে সাম্য-নীতি। অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যও সাম্য-নীতি প্রচার করেছিলেন, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপের অভাবে তা রয়ে গেছে শুধু শুভ ইচ্ছা। আর দুর্ব্বলতার কারণ এই জন্য যে ধর্ম্মাদর্শের কোনো বিশেষ রূপই তার চরম রূপ নয়; আদর্শের বিকাশ আছে তার রূপেরও বিকাশ আছে; কিন্তু ধর্ম্মাদর্শ সাধারণতঃ কঠিন-দেহ, কোনো ধর্ম্মাদর্শ-যদি একবার কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ লাভ করে তবে তারও রূপান্তর সহজসাধ্য হয় না। এর দৃষ্টান্ত--বিপক্ষের সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধ। সে ক্ষেত্রে একবার যে তলোয়ারের সম্বন্ধ বড় হয়েছিল তারপর সে তলোয়ারকে কোষবদ্ধ করা দুঃসাধ্য হচ্ছে, যদিও হজরত মোহম্মদের বহু কর্ম্মে ও কোর্‌আনে বিপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কে প্রীতি অগ্রগণ্য হয়েছে, মুসলমান সভ্যতায়ও মাঝে মাঝে এর প্রকাশ মনোজ্ঞ হয়েছে।

মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে খুব বড় যে ব্যাপারটি চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে বিচার-বুদ্ধি ও শাস্ত্রানুগত্য এই দুইয়ের ভিতরে কঠোর সংগ্রাম, আর সে-সংগ্রামে জনসাধারণের প্রাধান্য। ভারতেরও বিচার-বুদ্ধি ও বেদানুগত্যের ভিতরে যে-সংগ্রাম হয়েছিল তা কঠোর, কিন্তু সে-সংগ্রামে জনসাধারণ সাধারণতঃ হয়েছিল অনুবর্ত্তী, নেতা নয়। এর বড় কারণ হয়ত এই যে ইসলামের বাহন হয়েছিল একটি দুর্ধর্ষ চির-স্বাধীন জাতি। বহু বিরুদ্ধতার পরে একবার তারা হজরত মোহম্মদের বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করেছিল; কিন্তু বিকাশোন্মুখ মানুষকে যে নানা মতবাদের কাছে বারবার মাথা নত করতে হয়, অবশ্য কৌতূহলে ও অনুরাগে, সে-কথা ভাল করে' বুঝবার মতো অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির পূর্ব্বেই আর একটি দুর্দ্ধর্ষ জাতি অর্থাৎ তাতার জাতি, এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ইসলামের পরিচালনায়। তাই ইসলামের আবির্ভাব থেকে প্রায় চার শত বৎসরের মধ্যে চিন্তার অশেষ বৈচিত্র্য মুসলমান জগতে

Scanned with CamScanner

প্রকাশ পেলেও সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের জন্য একাল পর্য্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী হয়ে আছে দুইটি বিষয়—কোর্‌আন ও হজরত মোহম্মদের বাণী, অথবা, সোজাসুজি ভাবে এই দুইয়ের অনুবর্ত্তিতা। এর বাইরে আর একটি ব্যাপারও দীর্ঘকাল তাদের চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল—সুফীর অধ্যাত্ম-বাদ বা অন্তর্জ্যোতিঃ-বাদ, বিরাট ব্যক্তিত্বশালী ইমাম গাজ্জালীর প্রভাবে এই মতবাদের বিস্তার ঘটে। কিন্তু শাস্ত্রানুগত্যের সঙ্গে যে ভাবে যুক্ত করে এই তত্ত্ব তিনি জনসাধারণকে দিয়েছিলেন তারই ভিতরে নিহিত হয়েছিল এর ভবিষ্যৎ অসার্থকতার বীজ।

মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে বিচার-বুদ্ধির পরাভব ব্যাপারটি বেশ বুঝে দেখবার মতো। মুসলমান চিন্তাশীলদের তিনটি বড় দলে ভাগ করে দেখা যেতে পারে--বিচার-পন্থী, মধ্য-পন্থী, একান্ত-শাস্ত্রানুগত্য-পন্থী। বিচার-পন্থীরাও এক হিসাবে শাস্ত্রানুগত্য-পন্থী, তবে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যায় বিচার-বুদ্ধির সহায়তা তাঁরা বিশেষভাবে গ্রহণ করতেন। এই দলের এক আদি ব্যক্তি আব্বাসীয় শাসনের প্রারম্ভের ইমাম আবু হানিফা। তাঁর মতানুবর্ত্তী হানাফী-দল মুসলমান-জগতে, বিশেষ করে' ভারতবর্ষে, সংখ্যা-গরিষ্ঠ; কিন্তু নামে হানাফী হলেও তাঁর শিষ্যদের প্রভাবে প্রায় প্রথম থেকেই তাঁরা মধ্যপন্থী। অর্থাৎ শাস্ত্রানুগত্যই তাঁদের জন্য বড় কথা, তবে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যও তাঁরা কখনো কখনো নেন। একান্ত-শাস্ত্রানুগত্য-পন্থীর দল মুসলমানের গৌরব-যুগে, যেমন আব্বাসীয় যুগে, তেমন প্রবলপ্রতাপ হন নাই। কিন্তু এই আব্বাসীয় যুগেই বিচারপন্থীরা এই দলের নেতা ইমাম হাম্বলের উপরে যে কঠোর অত্যাচার করে তার ফলে বিচার-পন্থীদের প্রতি মুসলমান-জনসাধারণের ঘৃণা ও অবিশ্বাস প্রবল হবার সুযোগ পায়। এর পরে সর্ব্বপ্রকার যুক্তিবাদের অসারতা ইমাম গাজ্জালী যখন বিশেষ দক্ষতা সহকারে প্রতিপন্ন করলেন এবং শাস্ত্রানুগত্য ও অন্তর্জ্যোতিঃ-তত্ত্ব সত্যান্বেষীদের জন্য শ্রেয়ঃ জ্ঞান করলেন তখন বিচার-বাদ স্বভাবতঃই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হলো। ইমাম গাজ্জালীর মত খণ্ডন করে' বিচার-বাদের ধ্বজা পুনর্ব্বার উত্তোলন করতে চেষ্টা করেন স্পেনীয় দার্শনিক ইব্‌নে রোশ্‌দ (Averroes)। কিন্তু তিনিও যুক্তি-বাদ জনসাধারণের জন্য কাম্য জ্ঞান করেন নাই। তাঁর মতের সমাদর হয় ইহুদিদের কাছে ও তাদের সহায়তায় ইয়োরোপে। ইয়োরোপীয় বুদ্ধির মুক্তির ইতিহাসে Averroes-এর আসন যে গৌরবের ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা সে কথা স্বীকার করেন। ইসলামের বিচার-বাদ এইভাবে যে সাগর-পার হয়ে গেছে তারপর তাকে ফিরিয়ে আনবার কিছু চেষ্টা করেছেন স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ ও আমির আলি। তাঁদের পূর্ব্বে রামমোহনের ভিতরে এই বিচার-বাদের প্রভাব বুঝতে পারা যায়।

আব্বাসীয় যুগের ইমাম হাম্বলের পরে একান্ত শাস্ত্রানুগত্য-বাদের বড় নেতা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়া। "আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্ত্তন"-বাদকে তাঁর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে তিনি পূর্ণাঙ্গতা দান করেন। কেবল কোর্‌আন ও বিশ্বস্ত-সূত্রে প্রাপ্ত হজরত মোহম্মদের বাণী মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য, এভিন্ন খলিফা, ইমাম, দার্শনিক, সুফী, কারো মতামতই মুসলমানদের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়; একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা জানানো যায়, পয়গম্বর, ইমাম, সুফী এঁদের কাছে প্রার্থনা জানানো ধর্ম্মবিরুদ্ধ—এই-সব মত তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সুফীর অন্তর্জ্যোতিঃ-তত্ত্ব তিনি আদৌ শ্রদ্ধা করতেন কি না বলা শক্ত, তবে কোর্‌আন ও হজরত মোহম্মদের বাণীর সহজ অর্থের একান্ত আনুগত্য তিনি মুসলমানদের জন্য যে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন এ সর্ব্ববাদিসম্মত। তদানীন্তন সমাজের সুফী-প্রাধান্যের জন্য তাঁকে নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল; কিন্তু জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেন। তাঁর অষ্টাদশ শতাব্দীর শিষ্য আবদুল ওয়াহ্‌হাব ও তাঁর অনুবর্ত্তিগণ এই মতবাদের প্রচারে সফলকাম হন, আবদুল ওয়াহ্‌হাবের নাম অনুসারে এই চিন্তাধারার সাধারণ নাম হয়েছে ওয়াহ্‌হাবী বা ওহাবী মত। সত্য বটে পীর-পূজা প্রভৃতি ওহাবী-নিন্দিত কর্ম্ম ও মত এখনো মুসলমান সমাজে লোপ পায় নাই, কিন্তু এ-সব শাস্ত্রবিরুদ্ধ অতএব প্রশস্ত নয়, এই বাণী মুসলমান জনসাধারণের কর্ণেও প্রবেশ করেছে।

এই ওহাবী মত বা "আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্ত্তন"-বাদ বর্ত্তমান মুসলিম-জগতে, বিশেষ করে' ভারতের মুসলমানদের মধ্যে, প্রবলতম মত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ-দেশে এই মতের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপরে শিখেরা অত্যাচার করে; ওহাবীরা সেখানে জেহাদ ঘোষণা করে। এই সংঘর্ষ ক্রমে ইংরেজ ও ওহাবীতে বর্ত্তে। ওহাবীদের দমন করতে ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু ওহাবী মত তখন যা ছিল এখন তার কিছু কিছু বদল হয়েছে। ভারতবর্ষ অমুসলমান রাজ্য, মুসলমান ধর্ম্মকর্ম্ম এখানে বাধাগ্রস্ত, এই বিবেচনায় ওহাবীরা একে "দারুল্ হর্‌ব্" ব'লে ঘোষণা করে—"দারুল্ হর্‌ব্"-এ শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজন মত জেহাদ ঘোষণা করা ধর্ম্মকর্ম্ম।* কিন্তু এখন ভারতবর্ষকে সাধারণতঃ "দারুল্ হর্‌ব্" ব'লে গণনা করা হয় না "দারুল্ ইস্‌লাম" বলা হয়, কেন না, এখানে মুলমানদের ধর্ম্মকর্ম্ম বাধাগ্রস্ত নয়। কাজেই ওহাবী মত এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধং দেহি ভাব পরিত্যাগ করে' (এর মতে) ভারতের তথাকথিত মুসলমানদের মুসলমানীকরণে মন

* Imperial Gazetter Vol. VII. P. 437 দ্রষ্টব্য।

দিয়েছে। তাই বাংলার সাধুসংকল্প হিন্দু যখন দুঃখিত হয়ে বলেন--মুসলমান চাষীরা তো আগে আমাদের পূজা-আর্চ্চায় বেশ যোগ দিত, আমাদের বাড়ীতে খেতেও তাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু দিন দিন সব কেমন হয়ে যাচ্ছে--তখন তাঁর প্রতিবেশীদের ঘরের খবর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় তিনি দেন।

এই ওহাবী মত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করলে কেন সে-কথাটি বুঝে দেখবার মতো। কিন্তু বিশাল ভারতের চাইতে এই সমস্যাটি মুখ্যতঃ বাংলা দেশে সংকীর্ণ করে' দেখাই নানা কারণে সঙ্গত মনে করি। এই সম্পর্কে বাংলার মুসলমানের উৎপত্তি-কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারির রিপোর্টে মিঃ বেভের্লি (Mr. H. Beverley) বলেন, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাংলার হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত-ইস্‌লামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়। রিজলি সাহেব তাঁর Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহকারে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে বাংলার মুসলমান, বিশেষ করে' মুসলমান চাষী, বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বংশধর। এই মতের প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রব্বি। তাঁর The Origin of the Mussalmans of Bengal গ্রন্থে (এটি তাঁর পার্শীতে লেখা "হকিকত-ই-মুসলমানান-ই-বঙ্গালা"-র ইংরেজি অনুবাদ) তিনি এই ভাবে এমত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন:—

(১) তলোয়ারের জোরে এ দেশে ইসলাম প্রচার হয়ে থাকলে উত্তর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত। সেখানে মুসলমানের তলোয়ারের জোর বাংলার চাইতে কম ছিল না।

(২) বাংলার মুসলমান বাংলার উচ্চ বা নীচ কোনো স্তরের হিন্দুর বংশধর যে মুখ্যতঃ নয় তার ঐতিহাসিক প্রমাণ এই:—

(ক) "তারিখ-ই-ফেরিশ্‌তা," আবদুলকাদির বদাউনির "মন্‌তাখাবাত্তাওয়ারিখ" প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বাংলায় মুসলমানের আগমন থেকে আরম্ভ করে' নবাব সুজাখাঁর রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত বাংলার মুসলমান-শাসকরা এদেশে মুসলমানদের বসবাসের সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা অনেক মুসলমান-পরিবারকে জায়গীর প্রভৃতি দান করে' বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহু মুসলমান সৈন্যও এদেশে আগমন করে।

(খ) দিল্লী রাষ্ট্রবিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ছিল বলে' অনেক মুসলমান সুদূর বাংলায় বসতি স্থাপন নিরাপদ মনে করতেন।

Scanned with CamScanner

(গ) সম্রাট্ আকবর অনেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানকে বাংলায় নির্ব্বাসিত করেন।

(ঘ) সমুদ্র-পথে অনেক বিদেশী মুসলমান বাংলায় আগমন করে ও বসতি স্থাপন করে।

(ঙ) বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে ভাষাগত পার্থক্য আছে। দুজনেই বাংলা বলে কিন্তু ঠিক এক বাংলা নয়। মুসলমানের বাংলায় আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী।

(চ) রিজলি সাহেবের পদ্ধতি নির্ভুল নয়। কেন না, তিনি সব শ্রেণীর মুসলমানের নাকের মাপ নিয়ে গড় কযেননি, বেছে বেছে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের নাকের মাপ নিয়েছেন।

দেওয়ান সাহেবের গবেষণায় অন্ততঃ এই কথাটি প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলায় বাংলার বাইরের মুসলমান কম আসেন নি, অবশ্য দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার কত ভাগ তা বলা শক্ত। কিন্তু তাঁর সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে এই বড় যুক্তিটি দাঁড় করানো যেতে পারে, যুক্তিটি মুসলিম-ইতিহাস-বেত্তা ঢাকায় হাকিম হবিবর রহমানের। বিজেতারা সাধারণতঃ বিজিত দেশ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করে থাকেন, ভারতবিজয়ী মুসলমানদের বেলায়ও এনিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নাই, হিন্দুস্থানী সৈয়দ, হিন্দুস্থানী শেখ, হিন্দুস্থানী মোগল ও হিন্দুস্থানী পাঠানের উদ্ভব এই ভাবে—এই তাঁর মত। এ-মত যে গ্রহণযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। তাহলে দেওয়ান সাহেব যে বাংলার মুসলমানকে হিন্দু-রক্তের সংস্রবশূন্য মনে করেছেন তা আর টেঁকে না। এদেশের প্রাচীন মুসলমানদের স্ত্রী-গ্রহণ সম্পর্কে একটি কৌতুকাবহ নির্দ্দেশ ইব্‌নে বতুতার ভ্রমণ-কাহিনীতে আছে। মুসলমান রাজত্বের প্রায় সূচনায় তিনি এদেশে আসেন। তিনি লিখেছেন এদেশে স্ত্রীরূপে গ্রহণযোগ্য দাসী অল্প মূল্যে পাওয়া যেত, তাঁর সামনে একটি সুন্দরী যুবতী বিক্রীত হয়েছিল এক স্বর্ণ দিনারে অর্থাৎ দশ টাকায়। তিনিও প্রায় এই মূল্যে একটি অতি সুন্দরী দাসী কিনেছিলেন। অবশ্য এই সব দাসী কোন্ জাতীয়া ছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে শুধু মুসলমানদের কন্যাই যে এই ভাবে বিক্রীত হতো তা মনে করবার হেতু নেই।

দেওয়ান সাহেব রিজলি সাহেবের মত যেভাবে খণ্ডন করতে চেয়েছেন তাও আপত্তিকর। বাংলার চাষী সম্প্রদায়ের অনেকে হিন্দুর সন্তান এই তাঁর প্রতিপাদ্য। সে ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের তিনি যদি তাঁর গবেষণার বিষয় বলে গণ্য না করে' থাকেন তাঁর সেই কাজটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিক দিয়ে অসঙ্গত হয় না। অবশ্য আজকাল নাকের গঠন দিয়ে জাতি নির্ণীত হয় কি না তা নৃতত্ত্ববিদেরাই ভাল জানেন।

Scanned with CamScanner

দেওয়ান সাহেবের প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি হাণ্টার সাহেবের গেজেটিয়ারে আছে। তিনি বলেছেন, কিছুদিন পূর্ব্বেও বাংলার অনেক মুসলমান দুর্গা কালী লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করতো।

কিন্তু হাণ্টার সাহেবের এই যুক্তির বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। বাংলার কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানও দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন একথা সুপ্রসিদ্ধ। এর বড় কারণ বোধ হয় এই ওহাবী প্রভাবের পূর্ব্বে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা প্রতীক্-চর্চ্চার একান্ত বিরোধী ছিল না। পীরের কবরে বিশেষ ভক্তি-প্রদর্শন, দিনক্ষণ পুরোপুরি মেনে চলা, সমাজে এক শ্রেণীর জাতিভেদ স্বীকার করা, এসব ব্যাপারে মুসলমানের মনোভাব প্রায় হিন্দুর মতোই ছিল। তাছাড়া মুসলমান-লিখিত কাব্যে প্রতিমা-পূজারির ভক্তিনিবেদনের সৌন্দর্য্য অনেকদিন থেকে বর্ণিত হয়ে আসছিল; কাব্য-কল্পনায় আর বাস্তব জীবনে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা অনেক সময় মানুষের সমাজে হয়।

বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাগত যে পার্থক্যের কথা দেওয়ান সাহেব এবং একালের কোনো কোনো পদস্থ মুসলমান বলেছেন সে সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে পূর্ব্বে হিন্দুর ব্যবহৃত বাংলা ভাষায়ও আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা এখনকার চাইতে অনেক বেশি ছিল, টেকচাঁদের সাহিত্য তার এক প্রমাণ। একালে বাংলা সাহিত্যের উপরে পড়েছে সংস্কৃতের প্রভাব, আর একালের বাংলা সাহিত্য যে ভাবে গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে মুসলমানের চাইতে হিন্দুর যোগ অনেক বেশী বলে' হিন্দুর মুখের ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

দেওয়ান সাহেব তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি খণ্ডন করতে ভুলে গেছেন। অথবা ইচ্ছা করেই সেটি তোলেন নি। সেটি এই যে অনেক মুসলমান ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে এদেশের অনেক লোক মুসলমান হয়েছিল। শ্রীহট্টের শাহ্‌জালালের প্রভাবে সেই অঞ্চলের বহু অধিবাসী যে মুসলমান হয়েছিল ইব্‌নে বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তার উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের বেশভূষা যে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র রকমের ছিল—এখনও যেমন আছে—সে কথা "সিয়ার মোতাখেরীন"-এর অনুবাদক প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে উল্লেখ করে গেছেন। তিনি তাদের নামে মাত্র মুসলমান বলেছেন কেননা তারা মুসলমানী রীতিনীতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের মাথায় যে টুপি নেই এটি মুসলমানের পক্ষে তিনি খুব অদ্ভুত বিবেচনা করেছেন।

দেখা যাচ্ছে দেওয়ান সাহেবের মতের বিপক্ষেই যুক্তি প্রবল। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সন্তান, কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সন্তান, সে-তর্ক অবশ্য অর্থহীন। ছোট বড় হয়, বড় ছোট হয়। কোনো একশ্রেণীর লোককে সম্ভাবনার দিক দিয়ে বড় ভাবা কুসংস্কার। তাছাড়া বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাংলার বিশাল বৌদ্ধ-সমাজ থেকে উদ্ভূত হবার সম্ভাবনা বেশী।

কিন্তু দেওয়ান সাহেব প্রমুখ মুসলিমস্বাতন্ত্র্য-বাদীদের যুক্তি অপ্রবল হলেও এ-কথাটি মান্‌তেই হবে যে হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের ভিতরে চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। হিন্দু চাষী-শ্রেণীর লোকদের চাইতে মুসলমান চাষী কম শান্ত ও কষ্টসাধ্য কাজে মাথা দিতে বেশী অগ্রসর। এর কারণ কি? হিন্দু ও মুসলমানের এ রকম পার্থক্য শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহনও লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এর কারণ মাংসাহার। কিন্তু পল্লীর মুসলমান মাংস অতি অল্পই খায়। হিন্দু-মুসলমানের একালের মারামারির পরে থেকে হিন্দু-মতে-নিষিদ্ধ মাংসের প্রতি আকর্ষণ তাদের হয়তো কিছু বেড়েছে, কিন্তু বাস্তবিকই তা নগণ্য। খাদ্যের দিক দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে এতদিন বড় পর্থক্য ছিল পেঁয়াজ আর রসুনের ব্যবহার। কিন্তু এদুটি যদি এমন মহাশক্তি হবে তবে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা দিন দিন হীনবীর্য্য হয়ে পড়ছেন কেন?

চিন্তা ও বিশ্বাস-আদির পার্থক্য এই চরিত্রগত পার্থক্যের প্রধান কারণ বলে মনে হয়। এমতের সমর্থন পাওয়া যায় বাংলার হিন্দুসমাজের উচ্চ ও নিম্ন স্তরের লোকদের চরিত্রগত পার্থক্যের কথা ভাবলে। বাস্তবিকই চরিত্রগত পার্থক্য একালের বাংলার হিন্দু সমাজের এই দুই অংশের ভিতরে প্রকট হয়েছে। বহুদোষ সত্ত্বেও সে-সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের বলা যায় সাহসী ও চলন্তমনবিশিষ্ট, বহুগুণ সত্ত্বেও তার নিম্নস্তরের লোকদের এই সব বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। হিন্দুসমাজের নানা আচার ও সংস্কারের চাপ থেকে সে-সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা কিছু অব্যাহতি পেয়েছে জ্ঞানকৃত চেষ্টায়, আর বাংলার মুসলমান-সমাজের নিম্ন অংশের লোকেরা জীবনে কিছু সহজ সরল হতে পেরেছে উচ্চস্তরের লোকদের অবহেলার ফলে। বাংলার মুসলমান-সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা বাংলার হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মতো কেন দিন দিন মুখ্যতঃ আচার-ধর্ম্মী হয়ে পড়ছে তার উত্তর পাওয়া যাবে এই বিবরণের বহুস্থানে।

বাংলার এই মুসলমান-সমাজ, বিশেষ করে' এর সুবিশাল নিম্ন অংশ, যে অসার্থক জীবন যাপন করতো না তার পরিচয় রয়েছে সেকালের লোক-সাহিত্যে।

ওহাবীপ্রভাবের পূর্ব্বে মুসলমান সমাজের উপরে প্রবল ছিল সুফী-প্রভাব। মোটের উপর সেটি উদার মানবতার প্রভাব, কিন্তু আচারপরায়ণতা অলৌকিকতাপ্রীতি এসবও ছিল তার সঙ্গে যুক্ত।

এই সমাজ মানস শক্তির দিক দিয়ে তেমন সবল না হলেও ওহাবী-প্রভাবকে বাধা দিতে যে চেষ্টা না করেছে তা নয়। লালন ফকির প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান-বাউলদের গানে রয়েছে সেই প্রতিবাদের ঝঙ্কার। সে-চেষ্টা সফল হয় নাই কেন সে-সম্বন্ধে এই ক'টি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে :—

(১) অলৌকিকতার উপরে সুফী ও ওহাবী দুই মতেরই শ্রদ্ধা। কাজেই ওহাবীরা যখন পরম অলৌকিক কোর্‌আন ও হজরত মোহম্মদের পয়গম্বরত্বের দোহাই দিলেন মুসলমান হিসাবে তখন অপর পক্ষের প্রায় কোনো উত্তরই রইল না।

(২) অনুবর্ত্তিতা দুইয়েরই ধর্ম্ম। সে-ক্ষেত্রে পীরের অনুবর্ত্তিতার চাইতে পয়গম্বরের অনুবর্ত্তিতার মহিমা বেশী মনে হওয়া স্বাভাবিক।

(৩) এই মুসলমান-সমাজে কু-আচার যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন ইসলামের উন্নততর আচারের সামনে সেসব নতশির না হয়ে পারে নাই।

কিন্তু দীর্ঘকালের জীবনধারার প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক মমতা তাকে এই সব যুক্তি জয় করতে পারতো না যদি রাজনৈতিক কারণ এর সহায়রূপে এসে না দাঁড়াত। বস্তুতঃ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ওহাবী আন্দোলনকে এক রাজনৈতিক আন্দোলন বলেও গণ্য করা যেতে পারে—ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের গা ঝাড়া দেবার ও এক চেষ্টা। ভারতে অথবা বাংলায় রাজনৈতিক কারণ যে এর প্রভাবের মূলে তা বোঝা যায় ব্রিটিশ শাসন-কালে মুসলমানদের অবস্থার ইতিহাসের কথা ভাবলে। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই ঃ—

হিন্দুসমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের আনুকূল্যে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে মুসলমানেরা যে খুব বিচলিত হয় নাই তা বোঝা যায় এই দুটি ব্যাপার থেকে ঃ—

(১) ইংরেজের অধিকৃত বাংলায় প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলিকাতা-মাদ্রাসা ইংরেজের আনুকূল্যে মুসলমানদের লাভ হয়;

(২) ইংরেজ শাসনের সূচনায় হিন্দু প্রধানতঃ রাজস্ববিভাগে ও মুসলমান প্রধানতঃ বিচার-বিভাগে নিযুক্ত থেকে জীবিকা অর্জ্জন করতে থাকে। সেদিনে বাংলার মুসলমান যে বাংলাদেশে উন্নততর সম্প্রদায় ছিল রামমোহন রায় তাঁর বিলাতে সাক্ষ্যদানকালে ও হাণ্টার সাহেব তাঁর Indian Mussalmans গ্রন্থে সে কথা

বলেছেন--"When the country passed under our Rule the Muslims were the superior race."

মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হলো দশসালা বন্দোবস্ত থেকে, আর তাদের সম্ভ্রান্তদের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌঁছলো সনদ দেখাতে না পেরে যখন তাঁদের বহু নিষ্কর জমিজমা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল--ইংরেজিতে এর নাম Resumption Proceedings--আর যখন আদালতের ভাষা পার্শীর পরিবর্ত্তে ইংরেজি হলো। দশসালা বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার কেমন পরিবর্ত্তন হলো সে-সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের উক্তি এই:--

Muslim landlords or collectors of revenue did not directly deal with the Muslim peasants, and they employed Hindu bailiffs to collect the revenue direct from the peasantry. So the Hindus infact formed a Subordinate Revenue Service, and took their share of the profits before passing the collection on to the Muslim Superiors. The latter however were responsible to the Emperor and formed a very essential link in the Muslim Fiscal system. The series of changes introduced by Lord Cornwallis and Sir John Shore ending in the Permanent Settlement in 1793 put an end to this fiscal system of the Muslims.

The Permanent Settlement most seriously damaged the position of Mahomedan houses, for the whole tendency of the settlement was to acknowledge as the landslords the subordinate Hindu Officers who dealt directly with the husbandmen.

It elevated Hindu collectors, who upto that time had held but unimportant post to the position of the landlords, gave them a proprietory right in the soil and allowed them to accumulate wealth which would have gone to the Muslims under their own Rule. (Indian Musslmans)

এসব ব্যবস্থা যে মুসলমানদের শক্তিহীন করবার জন্যই করা হয়েছিল তা মনে হয় না, রাজস্ব যাতে বেশী পাওয়া যায় ও নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায় এইই ছিল শাসকদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এর ফল মুসলমানদের জন্য শোচনীয় হলো। এই সময়ে ভারতে আসে ওহাবী আন্দোলন। বাংলার ওহাবী আন্দোলন যে মুখ্যতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তা বোঝা যায় বাংলার ওহাবী-নেতা তিতুমিঞার বিদ্রোহ থেকেও:--

Titu belonged to the Wahhabi sect of Muhammadan fanatics, and was excited to rebellion in 1831 by a beard-tax imposed by Hindu

landholders. He collected a force of insurgents 3000 strong, and cut to pieces a detachment of Calcutta militia which was sent against him. The magistrate collected reinforments but they were driven of the field. Evantually the insurgents were defeated by a force of regulars and their stockade was taken by assault. (Imp. Gazt. Vol. XXIV--p. 71.)

ওহাবীরা ইংরেজের হাতে যখন অনেকখানি নিস্তেজ হলো তখন ইংরেজ ও মুসলমানে সম্পর্ক দাঁড়াল এই—ইংরেজ সহজেই সকল মুসলমানকে শত্রুপক্ষ ভাবলো এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহারে সদয়তা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না; মুসলমানদের সবাই যে ওহাবীমতাবলম্বী হলো তা নয় কিন্তু ইংরেজের প্রতি বিরূপতা তাদের ভিতরে ব্যাপক হলো। পার্শীর পরিবর্ত্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করা হলে মুসলমানরা প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু প্রতিবাদে ফল না পেয়ে তারা ইংরেজি শিখ্‌তে এগোলো না। হাণ্টার সাহেব বলেছেন—ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত শিক্ষা মুসলমানেরা পছন্দ করতে পারলে না।—কিন্তু মুসলমানদের খুব বড় অন্যায় এই হলো যে নতুন ব্যবস্থা সম্বন্ধে না-ই তারা বল্লে, ভাল করে বাঁচ্‌তে হলে কোন্ কোন্ ব্যাপারে হাঁ-ও বলতে হবে সে-চেতনা তাদের ভিতরে দেখা দিল না। অচিরেই তাদের অবস্থা এমন হীন হয়ে পড়লো যে সিপাহীবিদ্রোহের পরে স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ প্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করলেন শাসকদের বিষদৃষ্টির পরিবর্ত্তে প্রসন্ন দৃষ্টি মুসলমানদের জন্য লাভ করা।

মুসলমানদের দুর্গতির সঙ্গে চল্‌লো হিন্দুদের উন্নতি-চেষ্টা ও তাদের প্রতি শাসকদের আনুকূল্য। তাই ওহাবীরা যখন শান্ত হয়ে ঊনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধে মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারকরূপে এলেন তখন মুখে তাঁদের অনুবর্ত্তিতা তেমন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত না হলেও ধীরে ধীরে এদেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের মনে এ ধারণা দৃঢ়মূল হওয়া বিচিত্র নয় যে ধর্ম্মের আদিম ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া ভিন্ন ইহকাল ও পরকালের জন্য তাদের আর কি করবার থাক্‌তে পারে। হিন্দু-সমাজে সূচিত জাগরণ এ প্রতিক্রিয়া রোধ করতে সমর্থ হলো না কেন দ্বিতীয় বক্তৃতায় তার উত্তর দিতে চেষ্টা করা হবে।

আমরা দেখলাম ওহাবী প্রভাবে এদেশের মুসলমানদের একটি বিশেষ চেতনা লাভ হলো। এ আন্দোলনে তাদের কোনো উপকার যে না হয়েছে তা নয়—এর ফলে ভাববিলাসিতা থেকে কিছু উদ্ধার তারা পেয়েছে, কিছু সঙ্ঘবদ্ধও তারা হয়েছে। কিন্তু আদর্শ হিসাবে এর দুর্ব্বলতা এইখানে যে এ অতীতের ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়াই

সব চাইতে বড় কাজ মনে করে—সেই ব্যবস্থাই এর কাছে চিরন্তন ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য এ-মত সর্ব্বপ্রকার চিন্তার সম্প্রসারণের বিরোধী; সমস্ত রকমের নূতন পরীক্ষা সন্দেহের চোখে দেখা এর প্রকৃতি। এ-মত যে উন্নতিকামী জাতীয়তাবাদী আধুনিক মুসলিম জগতে বর্জ্জিত হচ্ছে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতের মুসলমান একে বর্জ্জন করতে পারছে না—তার নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে চেতনা তার এ-মতের বর্জ্জনের পথে বাধা হচ্ছে।

এই দশা থেকে এদেশের মুসলমান কি মুক্তি পাবে? না, নানা দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এইখানেই তার দৃঢ়স্থিতি হবে। এর সদুত্তর নির্ভর কর্‌ছে অনেকগুলো ব্যাপারের উপরে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তৃতায় সে-সবের আলোচনার চেষ্টা হবে।

২৬ মার্চ্চ, ১৯৩৫

দ্বিতীয় বক্তৃতা

দেশের জাগরণ

মুসলমানের গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতার ইতিহাস। তাই ওহাবী-প্রতিক্রিয়া যে বর্ত্তমানে তার প্রধান পরিচয়-স্থল হবে সে-কথা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু একালের হিন্দুর ইতিহাস তার জাগরণ-চেষ্টার ইতিহাস, তাই হিন্দুর সত্যকার পরিচয়, অর্থাৎ তার শক্তি ও দুর্ব্বলতা, সেই জাগরণ-চেষ্টার ভিতরেই খুঁজ্‌তে হবে। আর—হিন্দুর এই জাগরণ-চেষ্টা শুধু হিন্দুতে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়েরও সংক্রামিত হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জাগ্রত হবার চেষ্টা করেছে বলা যায়। দেশ যে বিরোধ-ব্যাধিতে ভুগছে তা থেকে উদ্ধার পাবার মতো জীবনী-শক্তি দেশের লোকদের মধ্যে আছে কিনা তারও সন্ধান পাওয়া সম্ভব দেশের এই বিচিত্র জাগরণ-চেষ্টার মধ্যেই।

দেশের একালের জাগরণ প্রধানতঃ তিনটি কেন্দ্রে হয়েছে— বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারত। এই তিনের আদি ও প্রধান কেন্দ্র বঙ্গদেশ। মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারতের জাগরণ-চেষ্টা তার সঙ্গে নানা ভাবে সম্পর্কিত।

বাংলায় ইংরেজের কুঠির পত্তন হয় আড়াইশ' বছর আগে। সেই সময় থেকেই বাণিজ্য-ব্যাপারে হিন্দু বাঙালীদের সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ইংরেজের নির্ম্মিত শহর অনেকখানি নিরাপদ জ্ঞান করে প্রায় সেই সময় থেকেই সেসব শহরে হিন্দুদের বসতি স্থাপনের চেষ্টা চলে আসছে। সেইজন্য বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে-জাগরণের সূচনা হোলো তাকে ইয়োরোপীয় সংস্রবের ফল বলে' দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমত প্রকাশ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ১৮৭৬ সালের সুরেন্দ্রনাথের Indian Association স্থাপনা পর্য্যন্ত, অথবা ১৮৮৬ সালের ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপনা পর্য্যন্ত, অথবা একাল পর্য্যন্ত, এই জাগরণ নানা ধারায় নানা ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে বা করে আস্‌ছে। কাজেই ইয়োরোপীয় সংস্রবের পরিচয় যে এর মধ্যে কখনো কখনো সুস্পষ্ট না হয়েছে তা নয়। তবু, সেই সংস্রবই এর প্রধান পরিচয় কিনা সেটি বিচার্য্য।

এই জাগরণের আদিপুরুষ রামমোহনের যে সমস্ত রচনা পাওয়া গেছে সেসবের মধ্যে তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-ই বোধ হয় প্রাচীনতম। এর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেছিলেন—রামমোহনের ধর্ম্মজীবনের সূচনা এখানে, এর পরে তাঁর সে-জীবনের পূর্ণাঙ্গতা লাভের পরিচয় আছে ব্রাহ্মসমাজের Trust Deed-এ। কিন্তু তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এর সঙ্গে রামমোহনের পরে পরের রচনা তুলনা করলে এইই দেখা যায় যে ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে কোনো পরিবর্ত্তন পরে তাঁর ভিতরে দেখা দেয় নাই, শুধু তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এ অবতার পয়গম্বর ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা তিনি যে অস্বীকার করেছিলেন পরে আর সেসব তেমন ভাবে অস্বীকার করেন নাই বরং স্বীকার করেছেন। আমি দেখাতে প্রয়াস পেয়েছি যে যেভাবে তিনি পরে মধ্যবর্ত্তী পয়গম্বরাদি স্বীকার করেছেন তা প্রকারান্তরে অস্বীকার করা—অর্থাৎ সাধারণতঃ তাঁদের যেভাবে পরিত্রাতা বা পরিত্রাণের ভারপ্রাপ্ত বলে' স্বীকার করা হয় তা তিনি মানেন নাই।* তবে তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীনে ও পরে পরের গ্রন্থসমূহে—যেমন হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা ও খৃষ্টান শাস্ত্রের আলোচনা—বড় পার্থক্য এই দেখা দিয়েছে যে তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এ রামমোহন সংস্কারক ঠিক নন কিন্তু পরে তিনি সংস্কারক। তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এ তিনি মনীষী—সত্য তন্ন তন্ন করে' সন্ধান করছেন ও তা যোগ্য ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। এখানে তাঁর যে প্রখর যুক্তিবাদ প্রকাশ পেয়েছে তাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখেছেন। তা সত্য হলেও সে-যুক্তিবাদের সঙ্গে রামমোহনের যুক্তিবাদের বড় পার্থক্য এই যে রামমোহন একই সঙ্গে প্রখর যুক্তিবাদী ও ঈশ্বরে-সমর্পিত-চিত্ত। তাঁর অবলম্বিত যুক্তি-পদ্ধতি মুস্‌লিম নৈয়ায়িকদের একথা তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এর অনুবাদক মওলানা ওবেদুল্লাহ্ স্বীকার করেছেন। মুসলিম দার্শনিকদের যুক্তিপদ্ধতিও তিনি ব্যবহার করেছেন। সেই দার্শনিকদের মধ্যে স্পেনীয় দার্শনিকরা নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসও তাঁদের অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁদের প্রভাবে রামমোহনের মানস-জীবন গঠিত হয়েছিল একথা স্বীকার করার পথে কোনো বাধা নেই অথচ একথা স্বীকার করলে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ-নির্দ্দেশ কিছু সহজসাধ্য হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে মুসলিম দর্শন শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য হয় নাই; রামমোহনের যুক্তিবাদের সঙ্গেও ঈশ্বর নিত্যযুক্ত। রামমোহনের প্রতিভার বেশ স্পষ্ট দুইটি ধারা—একদিকে তিনি মনীষী, বিচারকুশল; অন্যদিকে তিনি মানব-প্রেমিক—সমস্ত জ্ঞান ও বিচারের

* "সমাজ ও সাহিত্য"—পৃঃ ২১ - ২৩।

Scanned with CamScanner

সামাজিক মূল্য বড় করে' দেখেছেন। তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ওই শেষোক্ত লক্ষণ তাঁর প্রতিভার বড় লক্ষণ হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে রামমোহন সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর বড় পার্থক্য এই যে তাঁদের মতো তিনি ভক্ত ও কবি নন। তিনি ভক্ত ও মানবহিতাকাঙ্ক্ষী—সে-হিতাকাঙ্ক্ষীর লক্ষ্য মানুষের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের উৎকর্ষ-সাধন। মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর আধুনিকতা এইভাবে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর সেই আধুনিকতারও স্বরূপ বোঝা যাবে তাঁর সমসাময়িক ইয়োরোপীয় মনীষী গ্যেটের সঙ্গে তুলনায়। ফাউস্ট্-এ গ্যেটের যে-কথা যে ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক সেই ভুলের ভিতর দিয়ে তার কল্যাণাভিসারী পথ সে-কথা হয়ত রামমোহনেরও; তাঁর "ধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের" কথাটির এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উইল্‌হেল্‌ম্ মেইস্‌টার-এ গ্যেটে যে একটি আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন তাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, মানুষ শক্তিমান্ হয়ে প্রকৃতির উপরে ও নিজের উপরে অধিস্বামিত্ব লাভ করবে মানুষের এই রূপই গ্যেটে যেন সেখানে দেখেছেন, ভক্তিবাদকে তিনি যেন অবিশ্বাস করেছেন—এতে রামমোহন রাজি হতেন কিনা তাইই ভাববার কথা। বাস্তবিক, প্রখরযুক্তিবাদী, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উৎকর্ষাবকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, রামমোহন যে অন্তরে অন্তরে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ঈশ্বরানুরাগের উপরে, শুধু অন্তরে নয় সমাজ-জীবনেও তার প্রকাশ কাম্য জ্ঞান করেছিলেন, এই থেকেই বাংলার (অথবা ভারতের) ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছে। আমরা বল্‌তে চাই, বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ মোটের উপর একটি ধর্ম্মান্দোলন; কর্ম্মান্দোলনও তার সঙ্গে হয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে অতি-নিন্দিত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে অথবা ইয়োরোপের কোনো প্রধান দেশে যা হয়েছে তার সঙ্গে তার তেমন তুলনা হয় না। আর রামমোহনের পরে সেই কর্ম্মের প্রবাহ ত যথেষ্ট অল্পপরিসর।

রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ (সামাজিক কর্ম্মী হিসাবে) যে মুখ্যতঃ ভগবৎ-উপলব্ধি-কামী, অন্ততঃ, প্রধানতঃ সেই কামনার জন্য তাঁদের জীবনকে তাঁরা ধন্য মনে করেছেন, সে কথার প্রমাণ দেবার দরকার করে না। কেবল ডিরোজিও ও বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির মনে হয়। কিন্তু বিচারপন্থী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যয়শীলতা যে ডিরোজিওর অন্তরপ্রকৃতির বড় ধর্ম্ম ছিল তা বোঝা যায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর কবিতা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বোঝাই শক্ত।

Scanned with CamScanner

তাঁর প্রতিভায় বড় গুণের ও বড় দোষের এমন একত্র সমাবেশ ঘটেছে যে তাঁর কোন্ রূপ সত্যরূপ তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। তাঁকে বলা হয়েছে স্বদেশপ্রেমের পুরোহিত। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেমে সৃষ্টিধর্ম্মের চাইতে প্রলয়ধর্ম্মের বলবত্তর। তাঁর ধর্ম্ম ও সমাজ-বিষয়ক রচনাগুলোর বেশী মূল্য দেবার উপায় নেই, কেননা, তিনি নিজে সেসবের বেশী মূল্য দেন নাই—সেসবে বাদ-প্রতিবাদের ঝাঁজ মরে নাই। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যিক অর্থাৎ রস-স্রষ্টা হিসাবেই দেখ্‌তে হবে। সে-হিসাবে মধুসূদনের মতো তাঁকেও যদি দেখা হয় এই ধর্ম্মান্দোলন-যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাতে যুগের প্রকৃত রূপ আচ্ছন্ন হয় না†। বিদ্যাসাগরকে এযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখা দরকার, কেননা, তাঁর বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন শাস্ত্র-সমর্থিত হলেও তিনি নিজে একে জানতেন কাণ্ড-জ্ঞানানুমোদিত সামাজিক ব্যাপার ব'লে, এই মনে হয়।

রামমোহনের আবির্ভাব থেকে সুরেন্দ্রনাথের Indian Association স্থাপনা পর্য্যন্ত মোটামুটিভাবে এই ধর্ম্মান্দোলন যুগের স্থিতি-কাল বলা যায়, কেননা সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজনীতির প্রবর্ত্তক। নিজেকে তিনি অবশ্য জান্‌তেন ধর্ম্মপ্রাণ ম্যাট্‌সিনির শিষ্য বলে'; কিন্তু তিনি ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনেরই পরিচালক, শিক্ষিত ভারতবাসী কেমন করে' ইংরেজ শাসকদের মতো সুযোগ সুবিধা লাভ করে' সম্মানিত জীবন যাপন করবে এই ছিল তাঁর লক্ষ্য, একথা বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয় না। Indian Association-এর দশ বৎসর পরে ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়, আর কংগ্রেস রাজনীতিকে ধর্ম্ম থেকে পৃথক করে' দেখ্‌তে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রেও আনন্দমোহন প্রমুখ কর্ম্মীর সেবা দেশের লাভ হয়েছিল যাঁরা রাজনীতিকে জীবনের অন্যান্য প্রয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখেন নি, বরং জীবনের সমস্ত প্রয়াস এক বড় আদর্শের অঙ্গীভূত করে' দেখেছিলেন। কংগ্রেসের পূর্ব্বে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন তেমন প্রবলপ্রতাপ হয়নি এই বিবেচনা থেকে কংগ্রেস-স্থাপনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধর্ম্মান্দোলনের স্থিতিকাল বললে বেশী সঙ্গত হতেও পারে। এর পরে যে সব ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মীর আবির্ভাব দেশে হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ ও অশ্বিনীকুমার—তাঁরা রাজনীতিক্ষেত্র থেকে নিজেদের দূরেই রেখেছিলেন বেশী। সেইজন্য ভিন্ন কালে জন্মেও ধর্ম্মান্দোলন-কালের সঙ্গে তাঁরা নিবিড়ভাবে যুক্ত।

এই ধর্ম্মান্দোলন যুগ শুধু যে বাংলার গৌরব তা নয় সমগ্র ভারতের গৌরব।

† "সমাজ ও সাহিত্য"-এ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম্মান্দোলন-যুগের সঙ্গে এর তুলনা করলে এর ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে—চারপাশের দুর্ব্বলতার সঙ্গে এর সংগ্রাম তেমন প্রবল হয় নাই। তবু এই যুগের সাধকরা মাঝে মাঝে এমন দুই একটি কাজ করেছেন, দুই একটি কথা বলেছেন, যাতে ধূলিলুণ্ঠিত চতুষ্পার্শ্বের জীবনকে যেন মুহূর্ত্তের জন্য এক সুউচ্চ গ্রামের শোভা-সৌন্দর্য্য দেখবার শক্তি দান করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—রামমোহনের শিক্ষা সম্বন্ধে পত্র ও ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীড, ডিরোজিওর ভারত-বন্দনা, দেবেন্দ্রনাথের দুর্ব্বহ পিতৃঋণ সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার, কেশবচন্দ্রের "The term Brahmo is not included in the term Hindu", রামকৃষ্ণের সমস্ত ধর্ম্মের সাধন-চেষ্টা, বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর", রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" এরকম আরো কীর্ত্তি ও বাণী উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের আছে যার ভিতর দিয়ে মানুষের সৃজনী প্রতিভার পরমমনোজ্ঞ রূপ উৎসারিত হয়েছে। এ যুগের অনেক কাজে ও কথায় অভিনবত্বের ছটা অবশ্য কম। কিন্তু তাতে সেসবের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। ফুল পুরাতন, কিন্তু প্রতিদিন বাগানে বাগানে নতুন হয়ে ফুট্‌ছে। এ যুগ আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশের যে একটি শ্রেষ্ঠ যুগ সে-সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা দিন দিনই বেশী সচেতন হচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত-সাধারণের সঙ্গে একালের বাংলার এই স্রষ্টাদের কি সম্পর্ক সে কথাটি ভাল করে' বুঝে দেখবার প্রয়োজন আছে। এ-প্রশ্ন আমাদের শিক্ষিতদের মনে ওঠে না, তাঁরা মনে করেন, দেশের মানস জীবনের সহজ ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা পোষণ করবার কারণ উপস্থিত হয় নাই। দুশ্চিন্তা অবশ্য অসার্থক। কিন্তু দেশের মানসজীবনের ক্রমবিকাশ যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং দেশের একালের স্রষ্টাদের সঙ্গে দেশের শিক্ষিত-সাধারণের সম্পর্ক যে সাধনা ও সাধনার উত্তরাধিকারের সম্পর্ক নয় কৃতী পিতার ভদ্রাসন ও প্রতিপত্তির সঙ্গে পুত্রের যে সাধারণ সম্পর্ক সেই সম্পর্ক, এ কথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি।* কেন এমন হয়েছে সে-কথাটি সংক্ষেপে বলা যায় এই ভাবে ঃ—

রামমোহন থেকে দেশে যে নব চেতনা এলো তার বড় প্রকাশ হলো দুই ক্ষেত্রে—হিন্দু কলেজে ও ব্রাহ্মসমাজে। এ দুটিই হলো হিন্দু-সমাজের জন্য সংস্কার আন্দোলন—অবশ্য সংস্কারের চাইতে আন্দোলন বেশী। এই সময়েই হিন্দু-সভ্যতার লাভ হলো বৈদেশিক পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা। ফলে এই অনেকখানি দুর্ব্বল

* 'নব পর্য্যায়' দ্বিতীয় খণ্ড ও 'সমাজ ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

Scanned with CamScanner

সংস্কারকদের সংস্কার-চেষ্টাকে দাম্ভিকতা বলে' ভাববার সাহস হিন্দুসমাজের ভিতরে জাগ্‌লো। প্রেম-ও সৃষ্টি-ধর্ম্মী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে তাঁদের দলে পেয়ে তাঁদের অভ্রান্ততা-বোধ বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হলো। মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে ইমাম গাজ্জালীর প্রভাব যে-ফল ফলিয়েছিল একালের হিন্দুর চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবও সেই ফল ফলালো ; অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের কাছে সংস্কার-চেষ্টা একশ্রেণীর দুর্ব্বলতা মনে হলো, আর প্রাচীন সুপরিচিত ধারা নূতন মহিমায় মণ্ডিত হলো।

কিন্তু দেশের একালের এই সংস্কার-চেষ্টা বা নবজীবন লাভের চেষ্টা এর চাইতেও বড় আঘাত পেল দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তরফ থেকে। রাজনীতি অবশ্য মানুষের সমাজজীবনের খুব বড় ব্যাপার। কেউ যদি একে মানুষের জীবনের সব চাইতে বড় ব্যাপার জ্ঞান করেন তাঁর সঙ্গে তর্ক না করলেও চলে। কিন্তু আমাদের দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের রাজনীতি নামে ও ধরনধারণে রাজনীতি হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনমাত্র—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন আবেদন-নিবেদনের থালা বহন। শুধু এই ব্যাপারটি দেশের মানসজীবনের জন্য মারাত্মক হতো না ; এটি মারাত্মক হলো এই বিশেষ কারণে যে এই সামান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এর তরফ থেকে এমন ঢক্কা-নিনাদ দেশের দিকে দিকে বিঘোষিত হলো যে আত্ম-অন্বেষণের কঠোর প্রয়াস সহজেই দেশের লোকদের কাছে স্বাদহীন মনে হলো পর-চর্চ্চার স্বাদুতার সাম্‌নে।—কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন, এক সময়ের এই সৌখীন রাজনীতি চিরদিন সৌখীন থাকে নাই—স্বদেশী আন্দোলন, একালের রাজনৈতিক আন্দোলন, নানাজনের নানা ধরনের আত্ম-দান তার প্রমাণ। যাঁরা এমন কথা বলেন তাঁদের মধ্যে অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তি আছেন। তাই পরম বিনয়ে এই কথাটি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জীবনের সার্থকতার পথ ক্ষুরধার, যা প্রচণ্ড বা মোহকর তার গতি সেই পথে অবাধ যে হবেই এমন কথা নেই ; আর জীবনে যা অসার্থক তাকে সৌখীন না বলে' উপায় কি। আত্মদান অবশ্য অশ্রদ্ধার সামগ্রী নয় কখনো, কিন্তু নবতর অন্ধতার জন্মও যে তার থেকে সম্ভবপর সে সম্বন্ধে চেতনার অভাব মারাত্মক।

আমাদের দেশের রাজনীতি-চর্চ্চা একটি ক্ষুদ্র দলে আবদ্ধ বলে' যে তাকে আমরা অসার্থক বলতে সাহসী হয়েছি তা নয়। একটি দল কেন একজনের মধ্যেও রূপ লাভ করতে পারে সমগ্র দেশের কল্যাণ-সম্ভাবনা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক

অসার্থকতার মূলে আমাদের শিক্ষিতদের শোচনীয় আত্মসর্ব্বস্বতা ও অপ্রেম। যদি বলা যায় যে দেশের রাজনৈতিক চেতনার প্রারম্ভে তাঁরা পূজারি হয়েছিলেন পরিতোষ-দেবতার আর আজ পূজারি হয়েছেন অসন্তোষ-দেবতার তবে অপ্রিয় কথা বলা হয় সত্য কিন্তু অসত্যকথা হয়ত নয়। দেশ বল্‌তে যে বহু শ্রেণীর বহু মানসিক স্তরের লোক বোঝায়, আর দেশ-সেবা বল্‌তে যে সেই সব মানুষের উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত সাধনা বোঝায়, এসব কথা বলবার মতো লোক আমাদের দেশে কম জন্মাননি ; কিন্তু যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কর্ম্মী দেশের এই সমস্যার গুরুত্ব তাঁদের বোঝানো সম্ভবপর হয়নি। তার চাইতে তাঁরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছেন তাঁরা যে সংখ্যায় যথেষ্ট অতএব গণনীয় এই কথাটা বিদেশী শাসকদের বোঝাতে। তাঁরা যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সে-কথা মানতে হবে ; কিন্তু এই অপ্রিয় সত্যের সম্মুখীন তাঁরা যে হচ্ছেন না যে সব জয় জয় নয়, অনেক জয় পরাজয়েরই অন্য নাম, এইখানেই কর্ম্মী হিসাবে তাঁদের শোচনীয় দুর্ব্বলতা। ভাঙ্‌বার ক্ষমতার সঙ্গেই যুক্ত থাকে গড়্‌বার তাগিদ, এ সুচিন্তা নয়—মোহ ; এর বিপরীতটি অবশ্য সত্য—গড়্‌বার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকে ভাঙ্‌বার তাগিদ। যাঁর গড়্‌বার ক্ষমতার ভাঙ্‌বার তাগিদের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় নাই তাঁকে অনায়াসে বলা যায় কুকর্ম্মা। কর্ম্ম ও জ্ঞান এর কোনো ক্ষেত্রে আমাদের দেশের রাজনীতি যে সৃষ্টিপ্রবণ হয় নাই, যাঁরা সৃষ্টিপ্রবণ হয়েছেন তাঁদের প্রভাব সে-ক্ষেত্রে নগণ্য হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় আছে মনে হয় না। অথচ, এই রাজনীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছে দেশের সমস্ত মন!

দেশের দ্বিতীয় জাগরণ-কেন্দ্র মহারাষ্ট্র। বাংলার জাগরণের সঙ্গে তার যোগ নিবিড়। তবে মহারাষ্ট্রও স্বকীয়তা-বিবর্জ্জিত নয়।

মহারাষ্ট্রের জাগরণের নেতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। রামমোহনের সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার সেকালে তাঁরই লাভ হয়েছিল মনে হয়। রামমোহনের মতোই তিনি স্বদেশ-প্রেমিক আর তাঁর স্বদেশ-প্রেমও নিরভিমান। দুর্লভ মনীষারও তিনি অধিকারী ; তাঁর A theist's confession of faith সহজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তার গৌরব-স্বরূপ। বাংলায় তাঁর চাইতে সূক্ষ্মতর চিন্তার বিকাশ হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতো স্থিতধী প্রতিভা বাংলায় দুর্লভ।

এই রাণাডে জননায়করূপে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন সেটি বেশ বুঝে দেখবার মতো। তাঁর মনীষাকে তিনি আবৃত করেননি, ধর্ম্মে ও সমাজে হিন্দুর যে-সব আচার ও চিন্তা তিনি উন্নত জীবনের পরিপন্থী মনে করেছিলেন সে-সব সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত তাঁর মতামত। তবু কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি বড় জ্ঞান করেছিলেন মতবাদের

পরিচ্ছন্নতা তত নয় যত তাঁর চারপাশের লোকদের সঙ্গে নিবিড় যোগ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের উৎকর্ষের জন্য অতন্দ্রিত কিন্তু অনুৎকট প্রয়াস। এতে চিন্তার বিচিত্র প্রকাশ তাঁর অঞ্চলে হয়ত আজও তেমন হয় নাই ; কিন্তু পশ্চিম ভারতের লোকদের অর্থনৈতিক বোধ যে বাঙালীর চাইতে উন্নততর তার সঙ্গে তাঁর সাধনার যোগ বুঝতে পারা যায়। বিশেষ করে', দেশের সৃষ্টিধর্ম্মী রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্য গোপালকৃষ্ণ গোখেল যেরূপ কৃতী হয়ে গেছেন তাতে পরিচয় রয়েছে তাঁর সাধনার মাহাত্ম্যের। আশ্চর্য্য এই যে ইতিহাসে মারাঠাজাতির পরিচয় নির্ম্মম লুণ্ঠনকারীরূপে অথচ সেই জাতির ভিতরে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন মানবপ্রেমিক মনীষী। এ বিষয়ে রাণাডে নিজেও হয়ত সজাগ ছিলেন, তিনি নিজেকে উত্তরাধিকারী জ্ঞান করেছেন মারাঠা জাতির সাধুসন্তদের ও সেই সঙ্গে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের যুগ-যুগান্তরের ঋষি ও প্রেমিকদের।

মারাঠা জাতির সত্যকার নেতা রাণাডেই, অন্ততঃ দূর থেকে তাইই আমাদের মনে হয়। কিন্তু এই মারাঠা দেশে আর একজন শক্তিমান্ ব্যক্তিরও জন্ম হয়েছিল বৃহত্তর দেশের রাজনীতির উপরে তাঁর প্রভাব অসামান্য ; তিনি বালগঙ্গাধর তিলক। দেশ তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছে দুঃসাহসী নেতা জ্ঞানে। কিন্তু তাঁর শক্তি হয়ত বাংলার বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রলয়ঙ্কর শক্তি—দুর্য্যোগরাত্রির বিদ্যুৎ-ঝলক তাতে, পথের নির্দ্দেশ তার কাছে কেউ আশা করে না।

কিন্তু ভাবুক বাঙালী ও কাণ্ডজ্ঞানপ্রিয় মারাঠা দুয়েরই কাছে এই জাগরণ নাম পেল হিন্দু-জাগরণ। হিন্দু-সম্প্রদায়ে সূচিত হলো এই জাগরণ, তাতে উৎফুল্ল হয়ে সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু এর এই নামকরণ করলেন তা নয়। দেশের এই নবচেতনা যাঁদের দ্বারা সূচিত হলো সেই বরেণ্য স্রষ্টাদেরও অনেকের কাছে এই নাম সমর্থন পেল। এই হিন্দুজাগরণ কথাটা দেশের জীবনধারায় এত বড় জায়গা দখল করেছে যে একে ভাল করে' বুঝে দেখবার প্রয়োজন আছে।

এই হিন্দু-জাগরণ কথাটার ভিতরে মোটামুটি ভাবে তিনটি চিন্তাধারা রয়েছে। প্রথমতঃ, হিন্দু-জাগরণ বল্‌তে বোঝা হয়েছে পতিত হিন্দু-সমাজের সহজ ও সবল মনুষ্যত্বের স্তরে উত্থান। অন্যান্য উন্নত সমাজের মানুষ যেমন জগতে সম্মানিত জীবন যাপন করে' যাচ্ছে হিন্দু দীর্ঘকাল তা থেকে বঞ্চিত থাকলেও আবার তার সুদিনের উদয় হয়েছে, এই এ-মতের চিন্তাশীলেরা বলেন। এঁরা বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী মনে করেন, আর সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে' জাতিতে জাতিতে অথবা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সহযোগিতা কামনা করেন। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-জাগরণ বলতে

বোঝা হয়েছে হিন্দু-সভ্যতার অন্তর্নিহিত অনন্যসাধারণ শক্তির জাগরণ। হিন্দু-সমাজ অতি পুরাতন—বর্ত্তমান সভ্য জগতে প্রাচীনতম। তার সমবয়সী বা সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও কেবল সেই আজো ধ্বংসমুখে পতিত হয় নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে তার গঠনের মূলে অতি আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রয়েছে, তার এমন দীর্ঘ পরমায়ুর কারণ সেই বৈজ্ঞানিকতাই। এই মতের চিন্তাশীলদের ধারণা হিন্দু-সভ্যতা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা, হিন্দু-জাগরণের অর্থ সেই আশ্চর্য্য শক্তির জাগরণ—জগতের কল্যাণের জন্য। তৃতীয়তঃ, হিন্দু-জাগরণ বল্‌তে বোঝা হয়েছে ভারতের সর্ব্বব্যাপী এক বিশেষ প্রভাবের জাগরণ। এই মতের চিন্তাশীলেরা বলতে চান ভারতে আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড়, শক, হুন, প্রভৃতি বিচিত্র জাতির মিলনে মুসলমানের আগমনের পূর্ব্বে একটি বিশেষ মনোভাবের জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই মিশ্রিত জাতির সাধারণ নাম হিন্দু। মুসলমানেরা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে খুবই চেষ্টা করেছিল। তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই ; কিন্তু তাদেরও অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, নানা আচারে, হিন্দু-প্রভাব অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রভাব পড়েছিল। সে প্রভাব দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল। সেই ভারতীয়ত্ব কিছুদিন নিষ্প্রভ হয়ে ছিল, আবার তার শক্তি বোঝা যাচ্ছে। হিন্দু-জাগরণের অর্থ—এই ভারতীয়ত্বের জাগরণ। এদেশের সকলেরই শ্রদ্ধার বস্তু হওয়া উচিত এটি, কেননা এই-ই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দেশের সকলের সার্থকতা-লাভের পথ। কোনো সমাজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেওয়া এর স্বভাব নয়, তবে দেশের সব রকমের স্বাতন্ত্র্য যেন হয় এই মূল ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সুসঙ্গত।

হিন্দু-জাগরণের এই তিন অর্থের কিছু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হবে তৃতীয় বক্তৃতায়, আপাততঃ দেখবার দরকার হিন্দুর প্রধান সহকর্ম্মী ও প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানের চিন্তা ও কর্ম্মের উপরে এর প্রভাব। সে-ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে এই হিন্দু-জাগরণের প্রথম অর্থটি শিক্ষিত মুসলমানের অশ্রদ্ধেয় নয়। তৃতীয় অর্থটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করবার লোকও মুসলমান সমাজে আছে। কিন্তু এর দ্বিতীয় অর্থটি তাদের একান্ত অপ্রিয়। হিন্দু-জাগরণের এই অপ্রিয় অর্থটি দিন দিন মুসলমানের চোখে কেমন স্পষ্টতর হচ্ছে তার পরিচয় রয়েছে ভারতীয় মুসলিম-জাগরণের নেতা স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান ও তাঁর পদাঙ্ক-অনুসরণকারীদের প্রচেষ্টায়।

স্যর সৈয়দ বাল্যে মোগল সংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন। বোধ হয় সেইজন্যই স্বধর্ম্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্ত্বেও ওহাবী অসহিষ্ণুতার কবলে তিনি কখনো পতিত হন নাই। মোগল সংস্কৃতির সেই সৌজন্যই

তাঁকে হয়ত শক্তি দিয়েছিল দেশের সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও শুধু একদেশবাসী হিসাবে মানুষে মানুষে যে আর্থিক ও রাজনৈতিক যোগ আছে সে-সম্বন্ধে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। একটি বক্তৃতায় তিনি নিজেকে জাতিহিসাবে বলেছিলেন হিন্দু অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অধিবাসী। উন্নতিপ্রবণতার জন্য বাঙালীজাতির প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল ; কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক একজন বাঙালী হিন্দু নিযুক্ত হয়েছিলেন দেশে ভারতবাসী হিসাবে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তবু শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে' যেতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। মৌলানা মোহাম্মদ আলি কোকনদ কংগ্রেসে তাঁর অভিভাষণে স্যর সৈয়দের রাজনৈতিক মনোভাব বিশেষভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের সব ক্ষেত্রে মুসলমানেরা বড় বেশী পেছনে পড়ে গিয়েছিল, এই জন্যই স্যর সৈয়দ মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাঁর কথা মিথ্যা নয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের অপরিসীম দুঃখে পতিত হতে হয়েছিল, তার জন্য দেশের রাজনৈতিক জাগরণ, অর্থাৎ শাসকদের সঙ্গে যোঝাযুঝি, স্যর সৈয়দ যে মুসলমানদের জন্য অবাঞ্ছিত মনে করবেন, এ বোঝা যায়। কিন্তু এ ভিন্ন অন্য একটি উদ্দেশ্য যে তাঁর ছিল তা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নয়। তিনি ইসলামকে বলেছিলেন "এক লাজওয়াব নূর" (তুলনাহীন জ্যোতিঃ)—যা চিরউজ্জ্বল চিরপূর্ণাঙ্গ। হিন্দু-জাগরণ বল্‌তে যাঁরা বোঝেন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার জাগরণ তাঁদের সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর এই ইসলাম-ব্যাখ্যার মিল রয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় মুসলিম স্বাতন্ত্র্য স্যর সৈয়দ চেয়েছিলেন শুধু যে মুসলমানের দুর্ব্বলতার জন্য তা হয়ত সত্য নয়। মুসলিম সভ্যতার খ্যাতি জগৎ-জোড়া, সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারী ভারতীয় মুসলমান আপাততঃ হতশ্রী হলেও কেন চেষ্টা করে' দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের মতো সম্মানের পাত্র হবে না, তাদের চাইতে বেশী শ্রদ্ধার্হ হওয়াও তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়—এই ধরনের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হওয়া সেদিনে তাঁর পক্ষে কত স্বাভাবিক ছিল তা বোঝা যায় এই কথা ভাবলে যে সে-যুগে রাণাডের মতো মনীষী ও স্বদেশবৎসল ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে চেষ্টা করেও ভারতীয় জাতীয় জীবন বল্‌তে হিন্দু-জীবনই বুঝেছিলেন বেশী। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সৌহার্দ্দ্যই তখন ছিল জাতীয় জীবন সম্বন্ধে উচ্চতম ধারণা। 'হিন্দু-জাগরণ' 'মুসলিম জাগরণ' এ-সব 'দেশের জাগরণের' সঙ্গে কিভাবে সম্বন্ধ সে-ধারণা তখন দেশের শ্রেষ্ঠদের মনেও ছিল অস্পষ্ট।—তবু পূর্ণাঙ্গ জীবন

সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা স্যর সৈয়দ ও তাঁর কোনো কোনো সহকর্ম্মীর ছিল যেমন তাঁদের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ হিন্দু-জাগরণকামীদের ছিল। যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়—তাঁর এই ইসলাম-ব্যাখ্যা কল্যাণপ্রসূ হবে আশা করা যায়। কিন্তু মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তিনি যে জীবনের ব্রত করেছিলেন মনে হয় এরই ভিতরে রয়েছে তাঁর প্রতিভার সত্যকার মর্য্যাদা।

স্যর সৈয়দের পরে মুসলিম জাগরণের বড় বাহন সৈয়দ আমির আলি ও স্যর ইকবাল। আমির আলি অনেক বিষয়ে ছিলেন স্যর সৈয়দের যোগ্য পরবর্ত্তী। স্যর সৈয়দ জ্ঞানী হলেও প্রধানতঃ ছিলেন কর্ম্মবীর, মুসলমানের দুর্দ্দশা ঘুচিয়ে তাকে আধুনিক কালের লোকদের সঙ্গে সহজভাবে চলবার সামর্থ্য দেবার সাধনা ছিল তাঁর। আমির আলির চেষ্টা হয়েছিল—অনেকখানি স্যর সৈয়দেরই অনুবর্ত্তিতায়—মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত নিষ্করুণ সমালোচনার সৌজন্যময় প্রতিবাদ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানের সুমহৎ সম্ভাবনা প্রদর্শন। এঁরা দুজনেই যুক্তিবাদী ; আমির আলি নিজেকে বলেছিলেন মোতাজেলা-পন্থী। ইসলামতত্ত্ববিদ ডক্টর ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড এতে ঘোর আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে এই নব ভারতীয় মোতাজেলা-বাদ ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের ছদ্মনাম মাত্র। তাঁর কথায় সত্য আছে, কিন্তু ইউরোপীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে মোতাজেলা-বাদের দূর-সম্পর্ক যখন আছে তখন তাঁর এত আপত্তি অশোভন। তাছাড়া আমির আলির দাবীর সত্যতা বোঝা যায় তাঁর স্বসম্প্রদায়ের শিক্ষিত-সাধারণের উপরে তাঁর প্রভাবের স্বরূপের কথা ভাব্‌লে। তাঁর প্রভাবে তাঁদের স্বধর্ম্মানুরাগ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই অথচ সেই সঙ্গে জ্ঞান ও উদারতার প্রতি কিছু অনুরাগ তাঁদের মনে জেগেছে।

কিন্তু আমির আলির নেতৃত্ব তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোকদের জন্য স্যর সৈয়দের মতনও কল্যাণপ্রসূ হয় নাই তাঁর নিজের একটি মারাত্মক দুর্ব্বলতার জন্য। যে-দেশে তাঁর জন্ম সে-দেশে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তা ও কর্ম্মের যত আন্দোলন চলেছিল সে-সবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে নেই তা নয়, কিন্তু বড় অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত সে-সম্পর্ক। সুরেন্দ্রনাথের Indian Association-এর পরে ও কংগ্রেসের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তিনি Central Mohamedan Association-এর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার রাজনীতির প্রশংসা আমরা করতে পারি নাই, কিন্তু সেই রাজনীতির সঙ্গে তুলনায়ও আমির আলির রাজনীতি অদ্ভুত বলে' মনে হয়। তাঁর Central Mohamedan Association-এর প্রেরণায় বাংলার বহুস্থানে নানা শ্রেণীর 'আঞ্জুমান'

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মনে হয় তাতে বলবার বিষয় মাত্র এই দাঁড়িয়েছিল যে মুসলমান হিন্দু থেকে স্বতন্ত্র। স্যর সৈয়দের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্যর সৈয়দ স্বাতন্ত্র্যবাদী হলেও সৃষ্টিধর্ম্মী, কিন্তু আমির আলি, অন্ততঃ কর্ম্মক্ষেত্রে, শুধু স্বাতন্ত্র্যবাদী। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের রাজনীতির যে আদিরূপ—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আপন পদমর্য্যাদার জন্য অন্তহীন উপরোধ—আমির আলি তাকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছিলেন মনে হয়। তবে আমির আলির ভিতরে রাজনীতির চাইতে জ্ঞানানুরাগ প্রবল, তাই তাঁর স্বাতন্ত্র্যবাদ উৎকট আকার কখনো ধারণ করে নাই।

স্যর ইকবাল সমসাময়িক ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ যখন দেশে উৎকট হয়েছে তখন তিনি দাঁড়িয়েছেন মুসলিম নেতৃত্বের দাবী নিয়ে। তাই তাঁকে বুঝবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষকে বোঝা দরকার। এই বিরুদ্ধ পক্ষ কে? ঠিক হিন্দু-সমাজ নয়, তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ হিন্দু-সমাজে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটি মনোভাব। হিন্দুজাগরণ বলতে যাঁরা বোঝেন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের জাগরণ, আর যাঁরা বোঝেন ভারতের প্রকৃতি হিন্দু-প্রকৃতি, এই উভয় মতের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে তাতে। হিন্দুত্বের এই রুদ্র মূর্ত্তি এর সঙ্গে ইসলামের ওহাবী মতের আশ্চর্য্য মিল রয়েছে। দুয়ের উৎপত্তি-সূত্রও একই। মুসলমান জগতের শক্তিহীনতা থেকে ওহাবী প্রতিক্রিয়া জন্মলাভ করেছে, তেমনি হিন্দুর যুগযুগান্তের শক্তিহীনতা ও ব্যর্থতা-বোধ থেকে জন্ম হয়েছে এই রুদ্র-হিন্দুত্বের। হিন্দুত্বের এই রূপ হিন্দুসমাজে যে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা নয় কিন্তু মুসলমানের চোখে সে শুধু মাত্রার ভেদ। মুসলিম-বিদ্বেষ হিন্দুত্বের অতি বড় পরিচয়-চিহ্ন বলে' একালের মুসলমানদের মনে হয়েছে।

ইকবাল সেই কথাই খুব বড় করে বলছেন এই ভাবে—হিন্দুর অবলম্বিত জাতীয়তাবাদ দেশে সর্ব্বব্যাপী হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপনের ছদ্মনাম। তার সঙ্গে আরো তিনি বল্‌ছেন—মুসলমান তাতে রাজি হতে পারে না এই জন্য যে জগতের একটি অতি বড় আদর্শের সে বাহন, তাহলে সেই আদর্শ তাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। অথচ এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নব্য তুর্কীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ যদিও তিনি জানেন যে নব্যতুর্কী তাঁর ইসলাম-ব্যাখ্যা গ্রহণ করে না। অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমের পরিচয়ও তাঁর কাব্যে আছে, তাঁর 'নয়া শিবালয়' কবিতায় স্বদেশ-দেবতার পূজাকে তিনি বিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছেন। অল্পদিন পূর্ব্বের একটি অভিভাষণেও তিনি বলেছিলেন—ভারত যদি কবীর বা আকবরের মত গ্রহণ করতো তাহলে কথা ছিল না ; কিন্তু তা যে হয়

নাই সেজন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শ অম্লান রাখা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলে' তিনি মনে করেন। †

বোঝা যাচ্ছে ইকবাল পণ্ডিত হলেও দুর্ব্বল চিন্তা-নেতা—সমসাময়িক বিপর্য্যস্ত ভারতীয় জীবনের দ্বারা বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তিনি কবি, যখন যা বলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে বলেন, তাতে তাঁর বাণীর প্রভাব কম হচ্ছে না। ভারতের মুসলমানকে সব বিষয়ে হুঁশিয়ার হতে হবে এই বহুকালের অর্দ্ধস্ফুট কথা আপাততঃ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মুসলমানের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে।

হিন্দুসমাজের কর্ম্মীদের আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি—স্রষ্টা ও শিক্ষিতসাধারণ। এই দুইয়ের ভিতরে সাধনার যোগ ঠিক নেই এই আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। মুসলমান সমাজেও তেমনি স্যর সৈয়দকে ভাবা যায় স্রষ্টা আর তাঁর পরের কর্ম্মীরা প্রায় সবাই শিক্ষিত মাত্র। সৃষ্টিধর্ম্মী রাজনীতি নয় রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি উভয় সমাজের এই শিক্ষিত-সাধারণের প্রধান পরিচয়চিহ্ন। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে একালের স্রষ্টাদের যে সহজ ও নিবিড় যোগ একালের এই শিক্ষিত-সাধারণ সেদিক দিয়ে দুর্ভাগ্য।

দেশের জাগরণ-চেষ্টার যে পরিণতি হলো তা বেদনাদায়ক। 'হিন্দু-জাগরণ' 'মুসলিম-জাগরণ'-কামীদের কাছে যে অর্থে ব্যক্ত হলো তা নাও হতে পারতো। হিন্দুসমাজে সূচিত এই জাগরণকে হিন্দু-জাগরণ বলে' পরিচিত করবার আগ্রহ হিন্দু-সমাজে এমন প্রবল না হলেও অস্বাভাবিক-কিছু হতো না। রাজনীতি খেয়ালী না হয়ে সৃষ্টিধর্ম্মীও হতে পার্‌তো। কিন্তু অতীতের উপরে ফরমাস করা চলে না, তাই বর্ত্তমানের প্রয়োজন—সংযতভাবে দেশের এই নিষ্ঠুর বিরোধের দিকে তাকিয়ে দেখা, আর এর হাত থেকে দেশের লোকদের অব্যাহতি লাভের কি উপায় আছে তারই সন্ধান করা। এই বিরোধ সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার প্রয়োজন হবে তৃতীয় বক্তৃতায়, আপাততঃ সংক্ষেপে এই কথাটা বলা যায় যে, একদিকে মুসলমানের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত শক্তি-দৈন্য যার জন্য নবজাগরণ সহজ হতে পারে নাই তার ভিতরে অধিকন্তু সন্দেহশীলতা তাতে হয়েছে দৃঢ়মূল, অন্যদিকে হিন্দুর নবজীবন লাভের অকৃত্রিম প্রয়াস কিন্তু তারই সঙ্গে তার অদ্ভুত আত্মসম্পূর্ণতাবোধ যার জন্য নবজাগরণ সহজেই তার ভিতরে রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সৌখীনতায়—এই যে দেশের দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের

† All-India Muslim League-এ অভিভাষণ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০।

Scanned with CamScanner

দ্বিবিধ দুঃখ এর কোনোটিই যেন আমাদের সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা এড়িয়ে না যায়। এই দুই সমাজের দুঃখের স্বরূপ যদি দেশের লোকেরা বাস্তবিকই উপলব্ধি করতে পারে তবে সে-দুঃখ জয় করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

২৭ মার্চ্চ, ১৯৩৫

Scanned with CamScanner

তৃতীয় বক্তৃতা

ব্যর্থতার প্রতিকার

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আমাদের সামনে যে-রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাকে অবিশ্বাস করেন। তাঁরা বলেন—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বহু রকমের পার্থক্য আছে, তার জন্য তাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য কম, এ-সব কথা মানা যায় ; কিন্তু তাদের যে উৎকট বিরোধ আজ দেশে জেগেছে তার যথেষ্ট কারণ এই ধরনের মনোমালিন্যই নয় ; তাদের বিরোধের যা কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে তা সনাতন, তার ইংরেজি নাম Divide and Rule.—এর উত্তর বহুবৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এ ভাবে সমস্যাটাকে দেখলে এর কোনো মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা আমরা অর্থাৎ দেশের হিন্দু ও মুসলমান বড় দুর্ব্বল আর যাঁরা Divide and Rule করছেন তাঁরা অত্যন্ত সবল, বিচ্ছিন্ন কোনো দিন মিলিতের সঙ্গে বিরোধে জয় লাভ করতে পারে না।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁরও মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে মনে হয়। অন্ততঃ, তাঁর "রাশিয়ার পত্রে" এই কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী ভারতের শাসকবর্গ। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় তখন ঢাকার দাঙ্গা হয়। পরজাতির সামনে তাঁর স্বদেশবাসীদের সেই মূঢ়তা ও বর্ব্বরতা তাঁর যে গভীর লজ্জার কারণ হয়েছিল, মনে হয়, তারই জন্য এমন একটি ক্ষোভের সৃষ্টি তাঁর মধ্যে হয়েছিল।

যাঁরা বলেন সরকারী Divide and Rule নীতি দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দায়ী তাঁদের মোট বক্তব্য এই—ভারতে এখন হিন্দু কিছু প্রবল হয়েছে তাকে দমিয়ে দেওয়া রাজনীতির দিক দিয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই নীতি যদি বাস্তবিকই দেশের পরিচ্ছন্ন শাসন-নীতি হতো তাহলে সাম্প্রদায়িক বিরোধে এক পক্ষেরই বেশী জয়ী হওয়া স্বাভাবিক হতো। তা অবশ্য হয় নাই। খবরের কাগজের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বলতে হয়, এই সব বিরোধে কোনো কোনো স্থানে হিন্দু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোনো কোনো স্থানে মুসলমান বিশেষভাবে

Scanned with CamScanner

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, এমন ধরনের দাঙ্গা অনেক সময়ে হয়ে ওঠে হাটের মারামারির মতো ; হাটে মারামারি লাগ্‌লে কে যে কার শত্রু অনেক সময়ে সেই জ্ঞানই পায় লোপ, কেবল চলে অন্ধ আঘাত আর প্রতিঘাত ; কেউ নিরপেক্ষও থাকতে পারে না ; সেইভাবে কোনো কোনো সরকারী কর্ম্মচারীর কখনো কোনো পক্ষে ভিড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর নারদমনোবৃত্তিসম্পন্ন কর্ম্মচারীও একান্ত দুর্লভ না হতে পারেন। রাজশক্তির তরফ থেকে দেশের অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের অকৃত্রিম উন্নতি-চেষ্টা দেশের উন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের মনোদুঃখের কারণ হলেও প্রকৃষ্ট রাজনীতি—ভেদনীতি নয়।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধে স্পষ্ট ভেদ-নীতির দোষ শাসকদের না থাকলেও অন্য রকমের দোষ থেকে তাঁরা মুক্ত নন। সেটি হচ্ছে এ দেশের সমাজ ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপে তাঁদের ভীতি। সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতি হয়ত তাঁরা মন থেকে মুছে ফেলবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতবাসীর মনোভাবে যতটা অন্ধতা ছিল তার প্রভাব তাদের উপরে যে কম হয়েছে এ কথা স্বীকার করাও তাঁরা হয়ত সুবিবেচনা মনে করেন না। কিন্তু অন্ধতার প্রতিকার অন্ধতার দ্বারা হয় না। এদেশ যদি আচার-প্রধান হয়, অর্থাৎ বিচার এদেশের লোকদের কাছে সমাদৃত না হয়, তবে দেশের শাসন-কার্য্যের লক্ষ্য হবে সেই সব বিচিত্র আচারকে শুধু বিবদমান হতে না দেওয়া—এ-নীতিতে বুদ্ধির পরিচয় থাকলেও দৃষ্টি ও শক্তির পরিচয় নেই। সেই জন্য এ-নীতি শান্তির প্রার্থী হলেও পায় অশান্তিই ; কেননা, বিবাদের অবসানরূপ যে শান্তি জীবনে তা লাভ করা সম্ভবপর নয়। জীবনে শুধু লাভ করা যায় সৃষ্টিধর্ম্মের যে শান্তি, অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, তাই।

কাজেই যাঁরা ভেদনীতিকে দেশের সমস্ত ব্যাধির মূল কারণ বলে’ বুঝেছেন তাঁদের মত বদলাবার ক্ষমতা আমাদের না থাকলেও তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তি আছে সে-কথা বলবার অবসর আমাদের আছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের যত কারণই থাকুক তাদের নিজেদের বহুকালের বিকৃত বুদ্ধি যে তার মূলে এ কথাটা সূত্র-স্বরূপ ধরে নেওয়া সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নয়, কেননা শুধু ইতিহাস নয় বিচার ও আত্মবিশ্বাস এর অনুকূলে। পল্লীর খড়ের ঘরে যে আগুন লাগে তার আশু-কারণ হয়ত আগুন ও গৃহস্থের অসাবধানতা, কিন্তু যিনি এর প্রতিকারে অগ্রসর হবেন তাঁর কাজ হবে সহজদাহ্য এই গৃহগুলির সংস্কার। আর এ সংস্কারে গৃহস্থের আগ্রহাতিশয্যই স্বাভাবিক।

Scanned with CamScanner

হিন্দু ও মুসলমানের বিকৃত বুদ্ধিই যে তাদের বিরোধের মূলে এ চিন্তা আমাদের দেশের গত কয়েক শতাব্দীর শ্রেষ্ঠদেরও। তাঁরা এর নিরাকরণের চেষ্টাও কম করেন নাই। তাঁদের সেই সব চেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ এদেশে যখন হয়েছে তাদের মিলনের চেষ্টাও প্রায় তখন থেকে হয়ে আসছে। পাঠান-যুগের অনেক সাধু-সন্তের বাণীতে তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু এ-চেষ্টা বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে কবীর ও আকবরের মধ্যেই। আকবরের হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টার মূল্য তেমন দেওয়া হয় নাই। তাতে অন্যায় হয়ত তেমন হয় নাই, কেননা আকবর অপূর্ব্ব প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় চেষ্টায় খেয়ালিত্ব রয়েছে ঢের। তিনি যে বিভিন্ন ধর্ম্মের কিছু কিছু আচর গ্রহণ করেছিলেন সে-সমন্বয় তাঁর নিজেরই জন্য, সেটি সকলের হোক এ কামনা তিনি করেছিলেন মনে হয় না। আকবরের ভিতরে কবি-প্রকৃতি ছিল, বিভিন্ন রূপের পূজায় তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ তৃপ্ত হতো। এর দাম কম নয়। কিন্তু তাঁর সমন্বয়-চেষ্টা মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই মনে হয় হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ সম্পর্কে তাঁর বড় কীর্ত্তি হচ্ছে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার—মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠদের বা সর্ব্বযুগের প্রেমিকদের যা সাধারণ ধর্ম্ম।

মধ্যযুগের সমন্বয়কারীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বোধ হয় কবীরের ও তাঁর পরে দাদূ ও রজ্জবজীর। এক হিসাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় এঁদের চিন্তায়ই রয়েছে। মানুষকে এঁরা সব স্থূল আবরণ উন্মোচিত করে' দেখেছেন, আর সেই দেখাই যে সত্যকে দেখা সে-কথা পরম মনোহর ভাষায় প্রকাশ করে' গেছেন। তাই তাঁদের চিন্তা সমসাময়িক রূপ যা পেয়েছিল তাইই সে সবের চরম রূপ নয়। সব বিক্ষোভের ভিতরে সত্যকে শান্ত হয়ে দেখবার সঙ্কেত এসবে আশ্চর্য্যভাবে সঞ্চিত আছে।

কিন্তু এঁদের চেষ্টায় যে আশানুরূপ ফল ফলে নাই তার কারণ শুধু জনসাধারণের অক্ষমতাই নয়। এই ব্যর্থতার কারণ এঁদের বাণীর ভিতরেই নিহিত আছে মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমানের যে বিরোধ দেশে জাগ্‌লো তা শুধু চিন্তা-ধারার বিরোধ নয়, সেই বিরোধের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপও প্রবল। কিন্তু সে-সবের মীমাংসায় এই জ্ঞানীদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। কবীর বললেন—বেদ ও কোরআন ভব-বন্ধন স্বরূপ, ও সবের ভিতরে তুমি কেবল ঘুরপাক খেয়ে মরবে। তাঁর এ কথায় হিন্দু ও মুসলমানের আচার-পূজা যোগ্যভাবেই তিরস্কৃত হলো। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ-জীবনে আচার অর্থাৎ নিয়ম-কানুন বিসর্জ্জন সম্ভবপর নয়, তাই বেদ ও কোরআনের

প্রবর্ত্তিত আচার যদি গ্রহণ করা না হয় তবে অন্য কি আচার গ্রহণ করতে হবে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আবশ্যক। বলা বাহুল্য মানুষের বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রয়োজন এই জ্ঞানীদের বাণীতে মেটে নাই বলে' এদের বাণীর বিদ্যুচ্ছটা মানুষের অন্তর আলোকিত হয়েছে কিন্তু বিদ্যুতের মতোই ক্ষণকালের জন্য। সে-উপলব্ধিকে সমাজ-জীবনে সার্থক করা যাবে কি উপায়ে সে-সম্বন্ধে তেমন কোনো নির্দ্দেশ না পাওয়ার ফলে প্রাচীন চিরাচরিত পন্থাই তাদের জন্য পন্থা রয়ে গেছে।

উচ্চ চিন্তার এই যে সামাজিক রূপ গ্রহণে কুণ্ঠা, মনে হয় এ ভারতীয় চিন্তার মজ্জাগত দুর্ব্বলতা। একে যদি কেউ ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য বল্‌তে চান তিনি তা বল্‌তে পারেন। এর স্বপক্ষেও কিছু বলা যে না যায় তা নয়। কিন্তু তবু এ দুর্ব্বলতাই কেননা, শুধু সুবিবেচনা নয় ভয়ও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বহুকাল পূর্ব্বে এদেশে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের যে একত্র-সমাবেশ ঘটেছিল তার ফলে আচার-প্রাধান্যের সাহায্যে দেশে শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা হওয়া বিচিত্র নয়। সেই থেকে আচার-ধর্ম্ম এদেশে যে বড় ধর্ম্ম হয়ে আছে তা বার বার কিছু কিছু আঘাত পেলেও মোটের উপর বিশেষ প্রতিপত্তিই সম্ভোগ করে আস্‌ছে। মধ্যযুগের জ্ঞানীরাও এদেশের সমাজ-জীবনে হস্তক্ষেপ করতে-সঙ্কুচিত হয়েছেন এ কথা বলা যায়। এই আচার-প্রাধান্যের জন্যই এদেশে উচ্চ চিন্তা অনেকটা মানস সৌন্দর্য্যের ব্যাপার রয়ে গেছে। আর এইসব চিন্তা যে মানস-লোক থেকে কর্ম্ম-লোকে পদার্পণ করতে এমন সঙ্কোচ বোধ করেছে সেজন্য অদ্ভুতত্বের সঙ্গে এসবের সংস্রব দুর্লভ হয়নি। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—একদিন মহাপ্রভু চিন্তিত হলেন এই কথা ভেবে যে যবন-জাতি "গোব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার", তাদের উদ্ধারের কোনো উপায় দেখা যায় না ; তখন হরিদাস বললেন তাদেরও মুক্তি অনায়াসে হবে, কেন না হারাম হারাম বলে' তারা প্রকারান্তরে রাম নাম উচ্চারণ করে—নৃসিংহ পুরাণে আছে "দ্রংষ্ট্রীদ্রংষ্ট্রাহতে ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ। উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্" (অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। এ প্রসঙ্গ বাস্তবিকই চৈতন্যদেবের সঙ্গে হয়েছিল, না নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এটি ভক্তদের অতি-রঞ্জন, তা বলা শক্ত ; তবে "চৈতন্যচরিতামৃতে"র মতো একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে এ কথা যে স্থান পেয়েছে এই থেকে অনেক বোঝা যাচ্ছে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠদের চিন্তা-ভাবনার ধারা। সত্যকে নানা রকমে বার বার পরীক্ষা না করে' পূর্ণ সত্য বলে' গ্রহণ করার যে মনোবৃত্তি মোটের উপর তা অজ্ঞানতার সঙ্গে আপোষ। আর সত্যের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপ লাভ না হোলে তাকে পরীক্ষাই করা হোলো না বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে যে জাগরণ এলো মধ্যযুগের মতন মুখ্যতঃ তা ধর্ম্মান্দোলন একথা আমরা বল্‌তে প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু সেদিক দিয়ে মধ্যযুগের চাইতে এযুগের আন্দোলন দুর্ব্বল কেননা ব্যাপকভাবে মানুষের আত্মিক উৎকর্ষের কথা এ যুগের নায়করা যতটা ভেবেছেন তার চাইতে বেশী ভেবেছেন নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের পারমার্থিক ও আর্থিক উৎকর্ষের কথা। (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছিলেন বটে, ব্রাহ্ম হিন্দুর অংশমাত্র নয়, কিন্তু সেটি এক অমূল্য মুহূর্ত্তের প্রেরণার ফল, নিজেকে হিন্দু বলে' পরিচিত করবার আগ্রহ তাঁরও ভিতরে কম নয়)। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের মীমাংসা-চেষ্টা এযুগে হয়েছে গৌণভাবে মুখ্যভাবে নয়। তবু এই গৌণ চেষ্টার মূল্যও কম নয়। দেশের একটি স্থানে যদি প্রকৃত উন্নতি-চেষ্টা চলে তবে তার প্রভাব সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ-চেষ্টা যে সমাজধর্ম্মী হয়েছিল এজন্য দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে তার মর্য্যাদা মধ্যযুগের সাধনার চাইতে কম নয় বরং বেশী। সেই চেষ্টা কিভাবে রাজনৈতিক মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়েছে তা আমরা দেখেছি। বাস্তবিক, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে যে প্রকৃত সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল এইই হয়ত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বলতে যা বোঝায় দেশের সেই দুরবস্থা উত্তরোত্তর অপনোদন করে' চল্‌ত। এতেই এ সমস্যার মীমাংসা হয়ত হতো না, তবু বর্ত্তমানে এ বিরোধ যে ঘৃণিত রূপ ধারণ করেছে তা থেকে দেশ রক্ষা পেত।

দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্ম-অন্বেষণ-চেষ্টা অনেকটা রুদ্ধ হলেও হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা বরাবরই হয়ে আসছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সে-চেষ্টা অপ্রবল, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তার প্রাবল্য কম নয়। এই চিন্তার ক্ষেত্রে একালের দুজনের চেষ্টাই বিশেষ শ্রদ্ধার্হ হয়েছে—রামকৃষ্ণের ও রবীন্দ্রনাথের।

রামকৃষ্ণ দেবের "যত মত তত পথ" বাণী জগতের বিরোধসামঞ্জস্যের এক বড়ো মন্ত্র ব'লে কোনো কোনো মনীষী মত প্রকাশ করেছেন। সে চিন্তা-পদ্ধতিতে সত্য-দৃষ্টির চাইতে শুভ ইচ্ছা যে বড়ো একথা আমরা বল্‌তে প্রয়াস পেয়েছি; কেননা পথ নির্দ্দিষ্ট আছে এ সত্য নয়, পথ বারবার আবিষ্কার করতে হয় এইই সত্য—রামকৃষ্ণ দেবের পথও চিরাচরিত পথ নয় আবিষ্কৃত পথ।† তবে দেশের লোকদের যে অবস্থা তাতে এ চিন্তারও বিশেষ মূল্য আছে। দেশের লোকে যদি অন্ততঃ এই কথাটা বুঝতে পারে যে মানুষ বিচিত্র, মানুষের মতও বিচিত্র, সব এক ছাঁচে ঢালাই

† সমাজ ও সাহিত্য—পৃঃ ১৪—১৯।

সম্ভবপর নয়, তাহলেও বিরোধ-শান্তির অনেকটা সহায়তা হয়। "যত মত তত পথ" কথাটিতে নবসৃষ্টি-প্রবণতা যতখানি তার চাইতে সমাজ ও ধর্ম্মের প্রাচীন রূপের পূজার আগ্রহ বেশী। এর মধ্যে যে কাব্যসৌন্দর্য্য আছে তাতেই আকৃষ্ট হয়েছে অনেক ভাবুক ব্যক্তির চিত্ত, কিন্তু মানুষ আজ এত কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে যে তাদের দেশকালের পটে সাজিয়ে সাজিয়ে কল্পনার চোখে না দেখে সহজ ভাবে খোলা চোখে দেখবার প্রয়োজন বেশী হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়-বাদের দুইটি ধারা। একদিকে, তাঁকেও বলা যায় "যত মত তত পথ" বাদী—বিভিন্ন শ্রেণীগত ও দেশগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি শ্রদ্ধাপূর্ণ; আর এক দিকে তিনি বিশেষভাবে সৃষ্টিধর্ম্মী—মানুষকে দেশে কালে বিভক্ত না দেখে এক অখণ্ড বিকাশমান সমাজের সভ্যরূপে দেখেছেন, সমাজ-জীবনে উৎকর্ষ-লাভ যার জন্য চরম ও পরম। তাঁর Religion of Man গ্রন্থে তাঁর এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই যে বিকাশ-ধর্ম্মী মানুষ সমাজজীবনে অক্লান্তভাবে সৃষ্টিশীল হয়ে চলা যার জন্য সার্থকতার পথ, এর অভ্যুদয় দেশে না হলে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ বলতে আমাদের যে দুঃখ বোঝায় তা দূর হবে না এইই আমাদেরও প্রধান নিবেদন।

এই বিকাশ-ধর্ম্ম অথবা সৃষ্টিধর্ম্ম কি? খুব ঘোরালো না করে' সহজভাবে বলা যায়—জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে মানুষের যে অন্তহীন কৌতূহল সেইটি তার সৃষ্টিধর্ম্ম। শুধু নতুন কিছু করবার ঝোঁককে সৃষ্টি-ধর্ম্ম বলা অসার্থক, কেননা, জ্ঞান সেখানে তেজোহীন। যুগে যুগে মানুষ যে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছে, নূতন নূতন কর্ম্মের উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করেছে সে সব তার সৃষ্টি-ধর্ম্মেরই প্রেরণায়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে সৃষ্টি-ধর্ম্মের প্রভাবে মানুষ রাতারাতি আগাগোড়া বদ্‌লে গিয়ে অদ্ভুত-কিছু হয়ে ওঠে। হয়ত অন্তরের নূতন উপলব্ধির গাঢ়তার দিক দিয়ে সে বদ্‌লেই যায় ; কিন্তু, আসলে, মানুষ জীবনের পথে ধীরে ধীরেই চলে, একেবারে নূতন হয়ে ওঠা তার শক্তির বাইরে। চারপাশের জীবনের সঙ্গে মানুষ যে নিবিড় যোগে যুক্ত সৃষ্টি-ধর্ম্ম তাকে কখনো অস্বীকার করে না, বরং পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে তাতে ফুটিয়ে তোলে নূতন সম্ভাবনা—আর ক্রমাগত চলে এর কাজ।

এই যে মানুষের ক্ষমতা—পরিবেষ্টনকে নিয়ে নূতন হয়ে ফুটে ওঠা—এ শুধু পরমাশ্চর্য্য নয় অত্যাবশ্যক, যেমন অত্যাবশ্যক দেহের কোষাণুসমূহের অক্সিজেন সংস্পর্শে প্রতিমুহূর্ত্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হওয়া। আর যে-কারণে দেহ-শুদ্ধির এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মে—অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষায় অমনোযোগ অথবা অমনোযোগ—

সেই কারণে ব্যাহত হয় সমাজজীবনে সৃষ্টি-ধর্ম্ম। সমাজ-জীবনে এই অমনোযোগ বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এতরূপে যে সে-সবের নামকরণ অসম্ভব—যেমন স্বাস্থ্যের এক নাম কিন্তু ব্যাধির নামের অন্ত নেই—তবে আমাদের দেশে এর বড় পরিচয়স্থল হয়েছে ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের ধারণা। সে-ধারণায় অমনোযোগ, অন্যকথায় চারদিকের জীবনের সঙ্গে সংস্রবের অভাব এবং মোহের প্রভাব, এমন আশ্চর্য্য পরিণতি লাভ করেছে যে তার প্রাচীনত্ব রীতিমত সম্ভ্রমের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

হিন্দু-জাগরণ সম্বন্ধে আমাদের আরো আলোচনা করবার আছে। সেই জাগরণ-তত্ত্বেও দেখা যাবে, সেই প্রাচীন অমনোযোগের প্রভাব। হিন্দু-সমাজে সূচিত হয়েছিল এই জাগরণ এজন্য যদি একে হিন্দু-জাগরণ বলতে হয় তবে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সাধনার সাম্প্রদায়িক রূপকে অসঙ্গতভাবে বড় ক'রে দেখা হয়। তার চাইতে, এ জাগরণে হিন্দুত্ব কতখানি অহিন্দুত্বই বা কতখানি তা বোঝা যাবে যাঁরা জাগ্রত হয়েছিলেন তাঁদের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌লে। যে সব কর্ম্ম, যে সব চিন্তা, এমন কি যেসব ব্যক্তি থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন সেসবে হিন্দুত্ব যতখানি আছে অহিন্দুত্ব তার চাইতে মোটেই কম নেই; আর যাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন, প্রগাঢ় স্বজনপ্রীতি সত্ত্বেও, কোন্‌টি হিন্দু কোন্‌টি অহিন্দু এই বিবেচনার দ্বারা তাঁরা প্রেরণালাভের পথে চালিত হননি। বাস্তবিক, যাঁরা সৃষ্টিধর্ম্মী, সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রেরণা তাঁরা যে জগতের যে কোনো স্থান থেকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন, দেশ জাতি কাল এর কোনো ব্যবধান তাঁদের জন্য ব্যবধান হয় না, এই দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট কথা আমাদের দেশের অনেক সৃষ্টিধর্ম্মী ব্যক্তিও যে মাঝে মাঝে কেমন ক'রে বিস্মৃত হয়েছেন একথা ভাবলে বিস্ময়ে বিহ্বল হতে হয়। এর মুখ্য কারণ বোধ হয় এই যে সৃষ্টি-প্রবণতা তাঁদের মধ্যে স্বল্পক্ষণস্থায়ী হয়েছে, আর দেশের উচ্চশ্রেণীর ভিতরেও অজ্ঞানতার বহুবিস্তারের জন্য বিচারের পথ তাঁদের মনে হয়েছে দুস্তর।

দেশের একালের এই জাগরণের মূলে যত বিচিত্র প্রভাবের ক্রিয়া আছে সেসব বিস্মৃত হয়ে এবং সমস্ত দেশের জন্য এ-জাগরণ কত অর্থপূর্ণ সেই বৃহৎ দায়িত্বের পাশ কাটিয়ে হিন্দু-সমাজে আরব্ধ জাগরণ যে শুধু হিন্দু-জাগরণ নাম পেলে এই মোহ অথবা অমনোযোগ ধর্ম্ম-মোহ নাম পাবারই যোগ্য। ধর্ম্মের যে গোড়ার কথা মনুষ্যত্ব-বোধ তার সঙ্গে মোহের নিত্য-বিরোধ; এ-ধর্ম্ম হচ্ছে দীর্ঘকালের বিচারহীন আচারপ্রিয়তা—সাংসারিক জীবনের প্রচ্ছন্ন ব্যর্থতা-বোধ এই আচার-মোহকে অথবা

Scanned with CamScanner

ধর্ম্ম-মোহকে এমন মধুর করেছে মনে হয়। ধর্ম্ম-মোহই যে এদেশে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-ধর্ম্মের ব্যর্থতার প্রতিরূপ তার একটি বড় পরিচয় এই যে হিন্দু-জাগরণের প্রতিক্রিয়ায় দেশের মুসলমানদের ভিতরে বিশেষ ভাবে জাগলো সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-বুদ্ধি।

কিন্তু ধর্ম্মকে যাঁরা আগাগোড়া মোহ বলেন তাঁদের মত আমরা গ্রহণ করি না, কেননা জীবনের সার্থকতা ধর্ম্ম-বোধে, অর্থাৎ, সত্যে অথবা কোনো আদর্শে সমর্পিতচিত্ততায়। প্রচলিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও এরূপ সমর্পিতচিত্তদের জন্ম হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়—প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে মোহ থেকে মুক্ত ক'রে প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কি দেশের চিন্তাশীল কর্ম্মীদের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়? এই ভাবেই কি মানুষের সৃষ্টি-ধর্ম্ম বা বিকাশ-ধর্ম্ম সক্রিয় করে তোলা হবে না?

বলা বাহুল্য আমাদের দেশে এতদিন প্রধানতঃ এই চেষ্টাই হয়েছে। তাতে ফল যে হয় নাই সে কথা না বললেও চলে, কিন্তু ফল হয় নাই চেষ্টার দোষেও বটে; দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না ক'রে শুধু এই বিশ্বাসকে পাথেয়রূপে অবলম্বন করা হয়েছে যে সব ধর্ম্মের ভিতরেই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সত্য নিহিত রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিধানের জীবন-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে।

এ-অনর্থের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবপর হয় যদি ধর্ম্মকে চিরস্থির বিধানরূপে গণ্য না ক'রে আবিষ্কারের বিষয় ব'লে ভাবা যায়, তাহলে ধর্ম্মগ্রন্থ ও মহাপুরুষ হবেন জগতের চিন্তাশীল ও তাঁদের বাণীর মতো মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু—তার পূজা-আরতির বস্তু নয়। কিন্তু ধর্ম্ম-বিধানের পূজারি যাঁরা তাঁরা তাঁদের সাধ্যানুসারে উদারতম হয়েও এতে স্বীকৃত হবেন মনে হয় না। ধর্ম্মবিধানের উপরে বিচার-বুদ্ধির স্থান দান তাঁদের চোখে ঘোর অধর্ম্ম ব'লে বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক, যদিও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা প্রতিনিয়ত বিচার-বুদ্ধিকে বিধানের উপরে স্থান দান করছেন, কেননা বিধানের ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তন নিয়তই হচ্ছে।

আমাদের দেশের ধর্ম্মের যা প্রকৃতি তাকে নিছক আচার-পূজা না ব'লে উপায় নেই, সৃষ্টি-ধর্ম্ম তাই তার তরফ থেকে বাধাই বিশেষ ভাবে পায়। এহেন ধর্ম্মকে জীবন-নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া বাস্তবিকই বিপত্তিকর। কতখানি বিপত্তিকর তা বোঝা গেছে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা থেকে। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মকে এমন পূর্ণাঙ্গ জানেন যে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ তাঁর চিন্তার অতীত। তিনি সজাগভাবেই এ-মত প্রকাশ করেছেন। ধর্ম্ম

Scanned with CamScanner

বলতে তিনি যা বোঝেন তার ভিতরে আচারপ্রিয়তা থাকলেও প্রবল বিচার-বুদ্ধি বেশী ক'রে আছে; তাই তাকে জীবন-নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া অসঙ্গত বা অশোভন হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তার সেই অভিনবত্বের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকৃষ্ট না ক'রে তিনি যে তাদের হতে বলেছেন স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ এতে প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব নয় ধর্ম্ম-মোহই দেশে প্রবল হবার সুযোগ পেয়েছে। একালের বিবর্দ্ধিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য তিনি আংশিকভাবে দায়ী একথা তাই বলা যায়। অসাবধানতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যাঁরা তাকে মনে করেন সার্থকতার পথ, এত অভিজ্ঞতার পরে আমাদের বলতেই হবে, তাঁরা ভুল করেন।

কাজেই এই যে সুপরিচিত সিদ্ধান্ত যে হিন্দু হিন্দুত্বে নিষ্ঠাবান্ হ'লে এবং মুসলমান মুসলমানত্বে নিষ্ঠাবান হ'লে তাদের মিলন সম্ভবপর হবে এর উপরে যাঁদের নির্ভর তাঁরা সাধু-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েও অন্ধকারে পা বাড়ান। এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্ব্বে তাঁদের যাচাই করা উচিত—হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব বলতে তাঁরা কি বোঝেন। কিন্তু তেমন ভাবে যাচাই করতে গেলে তাঁদের অবলম্বন হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব হবে না, হবে এই দুয়েরই অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্ম্ম। অন্যভাবে কথাটা বললে দাঁড়ায়, হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতীতে ও বর্ত্তমানে যে-রূপ পরিগ্রহ করেছিল ও করেছে তাইই সে-সবের প্রকৃত রূপ একথা অর্থহীন, তার পরিবর্ত্তে এই সব ধর্ম্ম ভবিষ্যতে কি ভাবে মানুষের জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তির সূতিকাগার হবে এইই হওয়া চাই হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই বিশেষ সাধনার বিষয়। এই কথাই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে—যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।

এই সৃষ্টি-ধর্ম্ম অদ্ভুত বা দুঃসাধ্য কিছু যে নয় প্রতিদিন তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মানুষ আরো বড় হবে আরো সুন্দর হবে এ-বিশ্বাস মানুষের মর্ম্মমূলে। এত যে ধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তিত হয়েছে, এত বিচিত্র সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হচ্ছে, সৃষ্টি-ধর্ম্ম বা বিকাশ-ধর্ম্ম ভিন্ন এসবের মূলে আর কিসের প্রেরণা থাকতে পারে! তবে, মানুষ সৃষ্টি-ধর্ম্মী হলেও জাগ্রত ভাবে নয়। জগতের মানুষ একালে প্রায় একপরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সজাগ চেষ্টার পরিমাণ তাই যথেষ্ট বাড়াবার প্রয়োজন।

সৃষ্টি-ধর্ম্মী না হলে দেশের যুগযুগান্তরের সংগৃহীত আচারের দাসত্বই যে দেশের লোকদের জন্য বড় হয়ে থাক্‌বে, দেশের মনোজীবন ও সমাজ-জীবনের নব নব সম্ভাবনা তাদের মনে হতে থাক্‌বে দুরাশামাত্র, একথাটা আমরা মহামূল্য জ্ঞান করি বলেই যে-সব চিন্তাশীল বলেন, ভারতের যে বিশেষ প্রকর্ষ-ধারা জ্ঞাতসারে

হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তারই হওয়া উচিত ভারতবাসীর জীবনের নিয়ামক, তাঁদেরও কথা আমাদের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক করে। এই চিন্তাধারা যাঁদের তাঁরা খুব বড় এই কথাটি বলেন যে দেশের যে বহুকালের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও জীবন-ধারা তা সেই দেশের লোকদের স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, সেই স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে না চল্‌লে স্বভাব সময়ে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়। এঁরা আহার-বিহার পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ ক'রে বিশেষ বিশেষ আদর্শের অনুসরণ পর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্ব ব্যাপারে দেশের লোকদের যে দেশের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে বলেন এ খুব সঙ্গত কথাই বলেন। কিন্তু এই চিন্তাধারার ভিতরে দুর্ব্বলতা এই যে স্বভাব যে সৃষ্টিশীল আর সেই সৃষ্টিশীলতা মন্দ-গতি হলেও অশ্রান্ত-গতি, মানুষের কোনো দুর্ব্বলতার প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেমন তার স্বভাব নয় তেমনি কোনো দুর্ব্বলতাকে চরম দুর্ব্বলতা জ্ঞান করাও তার স্বভাব নয়— এই বড় কথাটা এর শ্রদ্ধার বিষয় তেমন নয়। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এই চিন্তার অধিনায়করা বেশ একটি সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করলেও মোটের উপর নির্দ্দেশহীন এঁদের বাণী। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কোন্ সংস্কৃতি বোঝা হবে— বৈদিক, না বৌদ্ধ, না পৌরাণিক, না মরমী, না মোগল, না ব্রিটিশ,—যদি এসবের মিশ্রণ হয় তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সে-মিশ্রণ কি কি ধরনের হবে কেন হবে—এসব প্রয়োজনীয় কথা সম্বন্ধে এঁদের কোনো সদুত্তর নেই। আসলে, এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁদের শ্রেষ্ঠরা সৃষ্টিধর্ম্মী, সেই সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁরা ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য্যায় থেকে কিছু কিছু প্রেরণা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত তাঁদের মতো সবাই যে কেবল ভারতের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করবেন এ সম্ভবপর নয়, অপ্রয়োজনীয় এবং কতকটা অসম্ভবও বটে। তাঁরাও কেবল ভারতের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেন না। শুধু বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় নয় জীবনের অনেক ব্যাপারে বিশ্বজোড়া একাকারত্ব একালে যেমন অপরিহার্য্য তেমনি বাঞ্ছনীয়। এর পরও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য মানুষের জন্য দুর্লভ হবে না, যেমন এক পরিবারে বহু রুচির লোকের জন্ম হয়, একই ভাষায় বহু মতের সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে।

একালের হিন্দুচিন্তাশীলদের (ভারতীয় না ব'লে হিন্দু বলাই সঙ্গত কেননা এক্ষেত্রে মুসলমান চিন্তাশীলেরা হিন্দুচিন্তাশীলদের অনুকারক মাত্র) এই যে বৈশিষ্ট্য-প্রীতি এটি ভাল ক'রে বুঝে দেখবার সময় এসেছে। কিছু আত্মসম্মানজ্ঞান অর্থাৎ গড্ডলিকাপ্রবাহে ভেসে না যাওয়ার ভাবটি যে এর মধ্যে আছে সেটি অবশ্য ভাল,

কিন্তু এ ভিন্ন এর বাকি সবটাই মনে হয় প্রচ্ছন্ন অভিমান, আরো সংকীর্ণ করে বলা যায়, প্রচ্ছন্ন জাতি-অভিমান অথবা ব্রাহ্মণত্বের অভিমান। যাদের রাজনৈতিক ভাগ্য মন্দ তাদের পক্ষে এমন অভিমানও মন্দ নয় কারো কারো এই মত ; কিন্তু অভিমানের জন্যও যে মন্দভাগ্য অচল হয় তা যথার্থ, কেননা অভিমান ও সৃষ্টি-ধর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী। এই অভিমান হিন্দুর জীবনশক্তির এক পরিচয়-চিহ্ন এই মত দেশে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু হিন্দুর জীবনী-শক্তি বল্‌তে যে ব্যাপারটার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করা হয় সেটি এত প্রশংসার্হ কিনা তাও ভাবা দরকার। হিন্দু বেঁচে আছে এ যতটা সত্য, নিজের চোখে ও জগতের চোখে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে বেঁচে আছে এ তার চাইতে কম সত্য নয়। তার চাইতে গ্রীক ম'রে গেছে কিন্তু ম'রে গিয়েও সে জগতের প্রেরণা-স্থল হয়ে আছে, এর গৌরব হয়ত বেশী। শুধু বেঁচে থাকাই অবশ্য গৌরবের নয় তাহোলে সে-গৌরব হিন্দুর প্রাপ্য নয়। হিন্দুর গৌরব এই জন্য যে এক সময়ে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্ম হয়েছিল তাঁদের প্রভাব আজো তাদের জীবনে সক্রিয়। কিন্তু তাইই যদি সত্য হয় তবে অভিমানের অবকাশ নেই, কেননা শ্রেষ্ঠদের প্রভাব সক্রিয় হয় তাঁদের পূজা-প্রদক্ষিণে বা গৌরবকীর্ত্তনে নয় তাঁদের মতো সৃষ্টিশীলতায়—আর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে একান্ত যোগ বিনয় ও সত্যানুসন্ধিৎসারই। ভারতীয়-সংস্কৃতিবাদ প্রভৃতি চিন্তা জীবনের দায়িত্ব পূর্ণভাবে স্বীকার না করারই নামান্তর ব'লে মনে হয়। পরিবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড় যোগের বাণী যে এতে প্রচারিত হয়েছে সেটি মহামূল্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সৃষ্টির ব্যাপারে স্বদেশ বিদেশ সবই উপকরণের ক্ষেত্র একথাও পুরোপুরি স্বীকার করতে হবে। স্রষ্টা স্বদেশ-দেবতারা অর্চ্চনা করেন বিশ্বজ্ঞান ও বিশ্বসৌন্দর্য্যের আলোকে।

পরিবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড় যোগ—এই কথাটি দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের দুই ভাবে বুঝবার প্রয়োজন আছে মনে হয়। মুসলমান-সমাজের নিম্ন অংশ সহজেই দেশের সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত। এই বাংলা দেশে তাদের সেই যোগের অনবদ্য পরিচয় রয়েছে লোক-সাহিত্যে ও লোক-সঙ্গীতে। কিন্তু মুসলমান-সমাজের উচ্চ বা সম্ভ্রান্ত অংশ সম্বন্ধে একথা তেমন ভাবে বলা যায় না। অথচ অল্প কিছুকাল পূর্ব্বেও এই সম্ভ্রান্ত অংশ নিজেদের পূর্ণভাবে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জেনেও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দান, অতিথি-সৎকার, দেশের গুণীদের সমাদর, ইত্যাদি ব্যাপারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁদের বর্ত্তমান আর্থিক অস্বাচ্ছল্য এর একটি বড়ো কারণ তা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কারণ যে তাঁদের পরিবর্ত্তিত মনোভাব বা "ওহাবী প্রতিক্রিয়া"। সে-কথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। তা কারণ যাইই হোক দেশের

Scanned with CamScanner

সঙ্গে সহজ প্রীতির যোগের অভাব তাঁদের মধ্যে যে ঘটেছে, এ শুধু তাঁদের জন্য লজ্জার কথা নয় শঙ্কার কথাও বটে, কেননা, এ তাঁদের জীবনের ব্যর্থতার এক নিদারুণ পরিচয়-চিহ্ন। আর হিন্দুর জন্য এই পরিবেষ্টনের সঙ্গে যোগ অনেকটা স্বাভাবিক মনে হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তা নয়। হিন্দুর সমাজজীবনে উচ্চ ও নীচের ভিতরে যে ঘোর ব্যবধান তাইই তার জন্য প্রিয় করেছে রক্ষণশীলতা—বিচিত্র ধরনের আত্ম-সম্পূর্ণতায় যার প্রকাশ। সে-রক্ষণশীলতায় জীবন কোনো রকমে রক্ষা পেলেও তার বিকাশ অথবা সৃষ্টি-ধর্ম্ম যে কেবলই বাধা পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে শিক্ষিত হিন্দু অপারগতা শিক্ষিত মুসলমানের দেশাত্মবোধের অভাবের মতনই ভয়ঙ্কর। এক হিসাবে ভারতের যুগযুগান্তরের ইতিহাস ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ইতিহাস। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, সব যুগেরই এইরূপ—ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় রাজাশ্রিত আর জনসাধারণ ভারবাহী। এমন ব্যাপার প্রাচীনকালে অবশ্য সব দেশেই ঘটেছে ; কিন্তু এ-ব্যবস্থা ভারতে যে এমন চিরস্থায়ী হবার উপক্রম করেছে, মনে হয়, তার মূলে দেশের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উৎকট রক্ষণশীলতাই—পরিবেষ্টনের সঙ্গে যোগ যেখানে বিকৃত।

এই দুই ভাগ্যবিড়ম্বিত দলের বিরোধ বর্ত্তমানে এমন দশায় এসে পৌঁছেচে যে একটিকে নির্মূল ক'রে বিরোধশক্তির কথা ভাবা অপরটির পক্ষে বিচিত্র নয়। এটি আসুরিক অতএব নিন্দনীয় এই কারো কারো মত। কিন্তু আসলে এ সম্ভবপর নয়। দেশের হিন্দু ও মুসলমান কারো গায়ে এত জোর নেই যে অপরকে পর্য্যুদস্ত করতে পারে। তাই সে-চেষ্টায় অগ্রসর হোলে কিছুকাল মারামারি ও তার পর রেষারেষি এই হবে সার। যাঁরা বলেন এমন মারামারিতে দেশের লোকদের ক্ষাত্রতেজ বাড়্বে তাঁদের মহাতেজা ক্ষত্রিয়দের কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত হওয়ার কথা স্মরণ করা ভাল। শুভ ও শুভ-ইচ্ছা চিরদিনই অশ্রান্ত সাধনার অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু এমন সাধনার দিকে দেশের লোকের মন রুজু হতে পারার অবস্থায় আছে কিনা সেটিও অবশ্য জিজ্ঞাস্য। দেশের অনেক কর্ম্ম ও চিন্তা-নেতা যে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সে-নৈরাশ্য তাঁদের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ব'লে ভাবাই ভাল। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ-ব্যাধি থেকে দেশকে মুক্ত করবার চেষ্টা যথেষ্ট হয় নাই এ মিথ্যা নয়। মধ্যযুগ থেকে একাল পর্য্যন্ত এই বিরোধ-মীমাংসার যত চেষ্টা দেশে হয়েছে সেসব থেকে নূতন প্রেরণাই আমরা লাভ ক'রে চল্‌ব যদি সেসবের সত্যকার মূল্যের দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকে, আর এই জ্ঞানের অভাব আমাদের ভিতরে না হয় যে দেশকে সুন্দর ও সার্থক করতে আমাদের অক্ষমতা আমাদের জীবনের চরম অসার্থকতার নামান্তর।

Scanned with CamScanner

এইখানেই বড় প্রয়োজন সৃষ্টিধর্ম্মী নব নেতাদের। অতীতের প্রতি তাঁরা হবেন শ্রদ্ধান্বিত, তার পূজারি কখনো নয়—তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হবে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। সেইজন্য সুপ্রাচীন "হিন্দু" ও "মুসলমান"-এর মিলন তাঁদের কাম্য হবে না, কেননা তা অসত্য ও অসম্ভব, তাঁদের কাম্য হবে একটি নব জাতি গঠন—যার সূচনা নানা ভাবে বহুকাল ধ'রে দেশে হয়েছে, দেশের একালের জীবনের জন্য যার প্রয়োজনের অন্ত নেই। মনোজীবন ও রাষ্ট্রজীবন দুই ক্ষেত্রেই অশ্রান্তভাবে চলবে তাঁদের সৃষ্টির কাজ। একালের যে ধর্ম্মসম্প্রদায়গত রাষ্ট্রজীবন সেটি কদাচ তাঁদের সমর্থনের বিষয় হবে না, কেননা, তার ফলে এদেশের অভিশাপ-রূপ জাতি-ভেদ নব নব সম্ভাবনা লাভ ক'রে চল্‌বে ; তাঁদের সাধনার বিষয় হবে দেশের জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ, কেননা, তারই ভিতরে নিহিত রয়েছে দেশের রাষ্ট্র-জীবনের, অথবা জীবনের, সত্যকার বিকাশ-সম্ভাবনা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের অভিমত কতকটা এই। তবে মনে হয় তাঁরা বেশী খেয়ালী। তাঁরা যে বলেন যে বৈদেশিক শাসনের ফলে দেশের আর্থিক ও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখ যত বেড়ে গেছে সেসব থেকে দেশকে মুক্ত ক'রে তার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে, এ মোটের উপর চমকপ্রদ কথাই বেশী। এর পরিবর্ত্তে সৃষ্টিধর্ম্মী কর্ম্মীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত জাপানের দিকে। মাঝে মাঝে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষতি-স্বীকার তার নিয়তি কিন্তু সেই নিষ্ঠুর নিয়তি স্বীকার ক'রে চলেছে তার উন্নতি-চেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কোনো এক কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, One step is enough for me—এক পা বাড়াতে পারলেই আমি খুসী—কর্ম্মের ক্ষেত্রে এ পাকা কথা। কোনো রকমের মোহ নয়, সত্যাশ্রয়িতা, প্রতিপদে সৃষ্টিধর্ম্মী কর্ম্মীদের অবলম্বন।

ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নয় জ্ঞান ও জাতীয়তা দেশের লোকদের শরণ্য হবে, নিঃসন্দেহ ; কিন্তু জাতি বলতে কি বোঝা হবে? বাঙালী, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী?—না ভারতীয়? ভারতবর্ষ বহুকাল ধ'রে একটি দেশ। ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় না হয়ে ভারতবাসীর পরিত্রাণও নেই। তবু আপাততঃ বাঙালী, মান্দ্রাজী ও পাঞ্জাবী হওয়াই বেশী ভাল মনে হয় ; কেননা তা বেশী স্বাভাবিক ও কম কষ্টসাধ্য। অবশ্য ভারতীয়ত্বের বিরোধী যে বাঙালীত্ব মান্দ্রাজীত্ব বা পাঞ্জাবীত্ব তা কদাচ কাম্য নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক। তার চাইতে এই কথা বলাই ভাল, ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে

Scanned with CamScanner

পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ। ইসলাম ও বেদান্ত মানুষের সৃষ্টি-শক্তিরই পরিচয়-চিহ্ন। মানুষের সেই সৃষ্টি-শক্তি কোনো দিন নিঃশেষিত হবে না, চিরদিন অক্লান্ত ও অম্লান থাকবে, এইই তার জন্ম-অধিকার। সে-অধিকার সত্য হোক।

২৮ মার্চ্চ, ১৯৩৫।

Scanned with CamScanner

পরিশিষ্ট

(ক)

সন-তারিখ

হজরত মোহম্মদ—মৃত্যু—	৬৩২	খৃঃ অঃ
প্রথম চার খলিফা	৬৩২-৬৬১	”
উম্মীয় শাসন	৬৬১-৭৫০	”
আব্বাসীয় শাসন	৭৫০-১২৫৮	”
ইমাম আবু হানিফা—মৃত্যু—	৭৬৮	”
ইমাম ইব্‌নে হাম্বল ”	৮৫৫	”
ইমাম গাজ্জালী ”	১১১১	”
ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ ”	১১৯৮	”

শাহ্‌জালাল— ত্রয়োদশ শতাব্দী

সিয়ার মোতাখেরীন—১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে অনূদিত

কলিকাতা মাদ্রাসা— ১৭৮১ ” স্থাপিত

হিন্দু কলেজ— ১৮১৭ ” স্থাপিত

ডিরোজিওর শিক্ষকতা ১৮২৬-১৮৩১ খৃঃ অঃ

আদালতে পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজি ১৮৩৬ খৃঃ অঃ

Indian Mussalmans—
সিপাহী বিদ্রোহের পরে রচিত ও প্রকাশিত

কেশবচন্দ্র সেন—মৃত্যু—১৮৮৪ খৃঃ অঃ

রাণাডে— ১৮৪২-১৯০১

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আলিগড় কলেজ স্থাপন।

স্বদেশী আন্দোলন— ১৯০৫

বৈদেশিক পণ্ডিত,

Dr. H. H. Wilson (1786-1860)

Maxmuller—(1823-1900)

Madame Blavatsky (1831-1891)

Scanned with CamScanner

পরিশিষ্ট

(খ)

প্রমাণ-পঞ্জী (সংক্ষিপ্ত)

[গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই এমন কয়েকজন গ্রন্থকার ও তাঁদের গ্রন্থের নাম।]

প্রথম বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজাপ্রজা।

নলিনীকান্ত গুপ্ত হিন্দুমুসলমান।

Vincent A. Smith— History of India.

Macdonald— Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional thought.

O'Leary— Arabic thought and its place in history.

Muhammad Ali—English Translation of the Quran

S. Khuda Buksh—Muhammad (Essay)

Encyclopaedia Britanica—Wahhabism.

আবদুল কাদের—ওহাবী বিদ্রোহ (জয়তী ও প্রদীপ)

Ibn Batuta in Bengal— Dr. N. K. Bhattasali's Early Independent Sultans of Bengal.

Cambridge History of India—Vols V & VI.

Nur Ahmad—Notes added to Momen Committee's Report on Muhammadan Education.

হাকিম হবিবর রহমানের অভিভাষণ—শিখা, ৫ম বর্ষ (ঢাকা)।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

Rammohan Centenary Booklet No. 1.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মপরিচয়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ,

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ—কোরআনের উর্দ্দুভাষ্য

Sir Muhammad Iqbal— Six Lectures on the reconstruction of Religious thoutht in Islam.

Natesan—Eminent Mussalmans

মুসাদ্দাস-ই-আলী।

হায়াত-ই-জাবেদ।

আবুল হুসেন—স্যর সৈয়দ (শিখা, ৩য় বর্ষ, ঢাকা)

Scanned with CamScanner

তৃতীয় বক্তৃতা

ক্ষিতিমোহন সেন— ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা

Lawrence Binyon— Aknbar.

Romain Rolland— Ramkrishna & Vivekananda.

আবুল হুসেন তরুণের সাধনা (সওগাত—১৩৩৬)

অন্নদাশঙ্কর রায়—হিন্দুমুসলমান (বুলবুল—১৩৪১)

S. Radhakrishnan—Hindu View of life.

Scanned with CamScanner